প্রভাত-কুমারী।

বর্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা-নিবাসী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত।

[১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, পুস্তকালয় হইতে]

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চৈতন্যপ্রেস,

৩৩৬ নং অপার চিৎপুররোড, কলিকাতা।

শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

মূল্য ।৶০ আনা।

প্রভাত-কুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-শয্যায়।

বি ক্রমপুরের জমিদার-বাটিতে আজ বড় বিপদ। বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী নবকুমার দত্ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রকুমার বিমর্ষ-বদনে পিতার অন্তিম-শুশ্রূষায় নিযুক্ত। গৃহে আর কেহ নাই।

বিক্রমপুর গঙ্গার উপনদী কুন্তীর তীরে অবস্থিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে অর্থাৎ মুসলমান-রাজত্বের শেষভাগে, বিক্রমপুর একটী সমৃদ্ধিশালী, বহুজনাকীর্ণ নগর। তথাকার জমিদার-বংশ দেশবিখ্যাত এবং রাজদরবারে বিশেষ পরিচিত।

কুশীর তীরে জমিদার মহাশয়ের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বহু-দূর হইতে লোক-লোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইত। পূর্ব্বাংশে অন্দর-মহল, বৈঠকখানা, তোষাখানা, খাজাঞ্চিখানা এবং আমলাগণের বাস। দক্ষিণে অতিথিশালা, দেব-মন্দির এবং পুষ্পোদ্যান। পশ্চিমে অশ্বশালা, হস্তিশালা, গোশালা ইত্যাদি; এবং উত্তরে লাঠিয়াল প্রভৃতি প্রায় শতাধিক কিঙ্করের আবাস।

বৃদ্ধ দত্তজা মহাশয়ের সংসারে বহু পোষ্য। আত্মীয়-কুটুম্ব, মাসী, পিসী, সধবা-বিধবা ভগ্নী, তাহাদের পুত্র-কন্যা প্রভৃতি দ্বারা, প্রশস্ত পুরী কোলাহলপূর্ণ। আজি সাত বৎসর হইল, তাঁহার পত্নী, সকলকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, বৃদ্ধের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়া, স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধের এক্ষণে দুই পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রকুমার, কনিষ্ঠ অবনীকুমার। মাতা বর্ত্তমান থাকিতে নরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল, অবনী এখনও অবিবাহিত। নরেন্দ্রের পত্নী নীহারকুমারী যদিও বয়ঃপ্রাপ্তা, তথাপি নবকুমারের বিধবা ভগ্নী সরলাসুন্দরী, এখন সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী।

আজি প্রায় একমাস হইল, জমিদার মহাশয়ের অল্প অল্প জ্বর হইতেছে; প্রথমতঃ তিনি সে বিষয়ে তত গ্রাহ্য করেন নাই। ক্রমে জ্বর বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন। তৎ-প্রদেশীয় তাৎকালিক বিখ্যাত কবিরাজ ও হাকিমের দ্বারা চিকিৎসা হইতে লাগিল। কোন উপশম হওয়া দূরে থাক, রোগের অবস্থা বরং শোচনীয় হইতে লাগিল। আজি তিন দিন হইতে দত্তজা মহাশয়

অচেতনাবস্থায় ছিলেন; সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অকস্মাৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল দেখিয়া, চিকিৎসক বিশেষ চিন্তিত হইলেন। নরেন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?"

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "গতিক ভাল নয়। এখন জ্ঞানের বেশ সঞ্চার হইয়াছে, জ্বরেরও ক্রমে বিরাম হইতেছে, নাড়ী অতি ক্ষীণ, রাত্রি আন্দাজ প্রহরেকের সময় সম্ভবতঃ পুনঃ জ্বর আসিবে; সেই শেষ। আর বাঁচাইতে পারিব না, ঔষধ প্রদান বৃথা। যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, এই উপযুক্ত সময়।"

নরেন্দ্রকুমার পুনরায় পিতার শয্যার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন, এবং পিতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কবিরাজের অনুমান প্রকৃত হইল। জ্ঞানের বেশ উদয় হইতে লাগিল; এখন তিনি বেশ লোক চিনিতে পারিলেন। গৃহে নরেন্দ্রকুমার, দেওয়ানজি, সরলাসুন্দরী ও অপরাপর কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন। নবকুমার নরেন্দ্রকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নরেন্দ্র নিকটে আসিলে অতি ক্ষীণস্বরে সকলের সমক্ষে কহিলেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আর বাঁচিব না। সময় থাকিতে তোমায় কতকগুলি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

অপরাপর সকলে বৃদ্ধের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সকলে চলিয়া যাইলে তিনি উপাধান-নিম্ন হইতে কয়েকটী চাবি বাহির করিয়া, নরেন্দ্রের হাতে দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "অবনী এখন কোথায়?"

নরেন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন। সত্য কথা বলিলে পিতৃদেব কুপিত হইবেন, কিন্তু না বলিলেও উপায়ান্তর নাই। পিতার অন্তিমকালে, তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত। শেষে কহিলেন, "আপনার পীড়া শুনিয়া অবনী বাটীতে আসিয়াছে।"

বৃদ্ধের মৃত্যু-বিবর্ণ-মুখমণ্ডল যেন আরও ভয়ঙ্কর হইল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "সে যেন আমার গতায়ু-দেহ স্পর্শ না করে। আমার সৎকারের পর আমার বাক্স খুলিলে, লাল ফিতায়-বদ্ধ কতকগুলি কাগজ দেখিতে পাইবে। সেগুলি মনোযোগের সহিত পড়িবে এবং তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেই পরিণামে সুখী হইবে।"

নরেন্দ্রকুমার পিতার মনোভাব স্পষ্টই বুঝিলেন। তিনি পিতার পদযুগল ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "পিতঃ! আপনাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, অবনীকে ক্ষমা করুন্। সে তাহার পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির জন্য বিশেষ অনুতপ্ত; আপনার আদেশ পাইলে সে আসিয়া আপনার চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "নরেন! তোমার হৃদয় অতি উদার, তাই তুমি সকলকে আপনার মত দেখ। অবনীকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, পরিণামে প্রবঞ্চিত হইবে।" বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিরস্ত হইলেন। নরেন্দ্র পুনঃ যুক্তকরে কহিলেন, "তাহার একটা উপায় করিয়া দিন; সে ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে ফিরিবে, কোন্ প্রাণে দেখিব।"

নবকুমার বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি যাহা করিবার

করিয়াছি, তুমি যাহা ভাল বুঝ, পরে করিও।” নরেন্দ্র কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়াছিলেন, কিছু সময় নিস্তব্ধভাবে শুইয়া রহিলেন। পরে নরেন্দ্রকুমারকে কহিলেন, “আমায় একটু জল দাও।” নরেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে পিতার মুখে জল প্রদান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দেড়প্রহর অতীত হইল। ক্রমশঃ নবকুমারের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি যতক্ষণ জীবিত ছিলেন, কাহারও সঙ্গে আর কথা কহেন নাই।

যামিনীর গভীরতা যতই বাড়িতে লাগিল, চন্দ্রমা যতই নীলাম্বরে পশ্চিমাবলম্বী হইতে লাগিল, নবকুমারের জীবন-প্রদীপও ততই নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বৃদ্ধ জমিদার নবকুমার দত্ত, আত্মীয়স্বজন ও নরেন্দ্রকুমারের হৃদয় শোক-শল্যে বিক্ষত করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃ-স্নেহ।

মৃত নবকুমার দত্ত গর্ব্বিত এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা পরিণত হইত। একবার কেহ তাঁহার বিরাগ-পাত্র হইলে, শত চেষ্টায়ও সে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিত না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার দুই পুত্র। নরেন্দ্রকুমার ও অবনীকুমার। নরেন্দ্রকুমার পিতা-মাতার সৎগুণগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবনী যাবতীয় অসৎগুণই প্রাপ্ত হইয়াছিল। নরেন্দ্রকুমার যেমন সৎবুদ্ধি, সরলচিত্ত, পরদুঃখ-কাতর এবং নম্র-প্রকৃতি, তেমনি অবনীকুমার শঠ, নীচ-প্রকৃতি, ক্ষুদ্রাশয় এবং পাপাসক্ত; অহঙ্কারে সদাই উন্মত্ত এবং উদ্ধত-স্বভাব।

নবকুমার পুত্রদ্বয়কে শিক্ষিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার যত্ন সর্ব্বপ্রকারে সফল হয় নাই। নরেন্দ্রে তাঁহার আশানুযায়ী ফল দেখিয়া, তাহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন; অবনীর বাল-জীবনে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাপময় ছায়া দেখিয়া, তাহাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, অবনীকুমার কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার কুলে কালী পড়িবে।

ক্রমশঃ উভয়ের যৌবন সঞ্চার হইল। অবনীর চরিত্রের বর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কতকগুলি কুক্রিয়াসক্ত নীচপ্রকৃতির লোক তাহার নিত্যসহচর হইল। নবকুমার জানিতে পারিলেন, অবনী মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছে, তিনি সাধ্যমত তাহাকে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যত্ন বিফল হইল দেখিয়া, তাহার হস্তে অর্থ সমাগমের উপায় বন্ধ করিলেন, কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। অবনীর অর্থ এখন অতি প্রয়োজনীয়। কারণ তিনি মদ্যপায়ী, পেটের অন্ন না জুটুক, কোনরূপে মদ্যের সংস্থান করিতে হইবেই হইবে। ইহার উপর একটী নীচবংশীয়া কামিনী এখন তাহার হৃদয়ের অধিকারিণী। তাহার সমগ্র খরচের সংকুলান করিতে হয়—সুতরাং এখন টাকায় তাহার বিশেষ প্রয়োজন। যাহা নহিলে চলে না, চেষ্টা করিলে প্রায়ই তাহা পাওয়া যায়। অবনীকুমারও পাইলেন। তিনি চুরি আরম্ভ করিলেন। তবে তিনি বড় সুবোধ, চালাক ছেলে; অপরের জিনিষ বড় একটা লয়েন না। প্রথমতঃ, মা হইতে আরম্ভ করিলেন।

আজ কাণের দুল, কাল গলার হার, পরশ্ব পায়ের মল হারাইতে লাগিল। নবকুমার সকলি শুনিলেন। অবনীকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিলেন। স্নেহময়ী জননীর উভয় সঙ্কট হইল। অবনী নিজ স্বভাব ছাড়িতে পারিল না, কিন্তু দুঃখিনী জননী পুত্রের পীড়ন-ভয়ে আর কোন কথা ব্যক্ত করিলেন না। তাঁহাকে বেশী দিন এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। বিসূচিকা রোগে হঠাৎ একদিন তাঁহার মৃত্যু হইল—অভাগিনীর সকল জ্বালা ফুরাইল।

পত্নীবিয়োগের পর নবকুমার একদিন পুত্রের প্রণয়-ব্যাপারের গুপ্ত-কাহিনী শুনিলেন। এতদিন তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তিনি অবনীকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"তোমার মত কুলাঙ্গার যেন আমার বাড়ীতে আর মুহূর্ত্তমাত্র না থাকে। আমার বংশে আজ পর্য্যন্ত কেহ মদ্য পান করে নাই, কিম্বা কোন নীচ কুলোদ্ভবা কামিনীর অবৈধ-প্রণয়ে আসক্ত হয় নাই। তুই কুলের কলঙ্ক—তোর মুখ দর্শনেও প্রত্যবায় আছে। তুই আজই আমার বাড়ী হইতে দূর হ'। তুই আমার ত্যজ্য পুত্র,—আমার বিষয়ে তোর কোন অধিকার থাকিবে না।"

মুহূর্ত্তের জন্ত অবনীকুমারের ভ্রম অপনীত হইল। নিজ দুরবস্থার ভবিষ্যৎ চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইল। অমনি পিতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নবকুমার ক্ষমা করিবার লোক ছিলেন না। কহিলেন, "যদি স্ব ইচ্ছায় বাড়ী হইতে বহির্গত না হও, ভৃত্য দ্বারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।"

অবনী পিতার স্বভাব বিলক্ষণ জানিত, সুতরাং অধিক

বলিতে সাহস করিল না;—বিষণ্ণমুখে পিতার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল এবং নরেন্দ্রকে সকল কথা কহিল। নরেন্দ্র অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পিতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না। তিনি অবনীকে কহিলেন, "ভাই! তুমি জান, পিতা যাহা বলেন, কখন তাহার অন্যথা করেন না; সুতরাং তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া গৃহে বাস করা তোমার পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নহে। তুমি গোপনে প্রতিমাসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যদি তুমি এখনও কুপথ হইতে ফিরিতে চেষ্টা পাও, ভবিষ্যতে পিতার মন প্রসন্ন হইতে পারে।" অবনী জ্যেষ্ঠের কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল; কিন্তু মদ্যপায়ীর প্রতিজ্ঞা কতদূর সত্যে পরিণত হয়, তাহা আজি-কালিকার পাঠককে আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না।

অবনীকুমার তাহার প্রিয়ভৃত্য চণ্ডীকে সঙ্গে লইয়া, পিতৃভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বিক্রমপুরে বাস তাহার পক্ষে শ্রেয় হইবে না ভাবিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী নালন্দা গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। টাকার প্রয়োজন হইলে চণ্ডীকে পাঠাইয়া দিত, নরেন্দ্রকুমার প্রাণপণে সোদরের সাহায্য করিতেন, এবং প্রায়ই ভ্রমণচ্ছলে বহির্গত হইয়া, অবনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে অবনীর আর কোন সমাচার পাইলেন না। একদিন নালন্দা গ্রামে যাইয়া দেখিলেন, বাসগৃহ শূন্য। ভ্রাতৃবৎসল হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। অবনী দুর্নীতি-পরায়ণ হইলেও নরেন্দ্র তাহাকে

প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভ্রাতার সন্ধানে পিতার অজ্ঞাতে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহার সন্ধান পাইলেন না।

অবশেষে কয়েক বৎসরের পর, নরেন্দ্রকুমার একদিন সন্ধ্যার সময় উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, হঠাৎ দীনবেশ, ক্ষীণকায় এক যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রকুমার শিহরিয়া কহিলেন, "একি! অবনী!"

আর বলিতে হইল না। অবনী অগ্রজের পদমূলে কাঁদিয়া পড়িল। নরেন্দ্রকুমার তাহাকে সাদরে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, উভয়েরই নেত্রে শতধারা বহিল। নরেন্দ্র পিতার বিনানুমতিতে, অতি গোপনে তাহাকে আপন কক্ষে লইয়া গেলেন। মলিনবসন ছাড়াইয়া, তাহাকে বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিলেন এবং আহারাদির পর দুই ভ্রাতায় একাসনে আসীন হইয়া, দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র অনুজের দুঃখ-বিবরণী শুনিয়া, অনেক অশ্রুজল ফেলিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই, নবকুমারের পীড়া হয়, এবং পিতার শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অবনী নরেন্দ্রকুমারের আবাসেই বাস করিয়াছিল। নরেন্দ্রকুমারের পত্নী নীহারকুমারীও দেবরের আদর যত্নের ত্রুটী করেন নাই। নীহারকুমারীর সেই অপ্রমেয় স্নেহই ভ্রষ্টপ্রকৃতি অবনীকুমারের কাল হইয়াছিল।

মহাসমারোহে নবকুমারের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। এখন অবসর পাইয়া, নরেন্দ্রকুমার মৃত পিতার আদেশ

অনুযায়ী, বাক্স খুলিয়া লাল ফিতায় বদ্ধ কাগজাদি বাহির করিয়া পড়িলেন। তিনি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাই সত্যে পরিণত হইল।

কনিষ্ঠ পুত্রের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, নবকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় নরেন্দ্রকুমারের নামে, দানপত্র লিখিয়া যান; তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

"আমার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রকুমার, আমার সমগ্র সম্পত্তি অধিকার করিবে। অবনী আমার ত্যজ্যপুত্র, বিষয়ে তাহার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না। নরেন্দ্র-কুমারের পুত্র-পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীস্বত্বে সমস্ত বিষয় ভোগ করিবে। যদি নরেন্দ্রকুমারের পুত্র সন্তান না হয়, বর্ত্তমান প্রভাত-কুমারীই ইহার অধিকারিণী হইবে। যদি দুর্ভাগ্য-বশতঃ উক্ত উত্তরাধিকারিণী অকালে কালপ্রাপ্ত হয়, কিম্বা তাহার সন্তানাদি না হয়, সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দেব-সেবায়, এক চতুর্থাংশ অতিথিসেবা প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ অবনী প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ কোন প্রকারে কপর্দ্দকও পাইবে না।"

নরেন্দ্রকুমারের চক্ষে শতধারা ঝরিল। তিনি এই প্রকারের একটা কিছু অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এত-দূর তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। তিনি অবনীকে আহ্বান করিয়া, ধীরে ধীরে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। অবনী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমার বিষয়ে প্রয়োজন কি! একটা পেট কোনরূপে চলিবেই।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পিতার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া

নরেন্দ্রকুমার পিতার নিকট অবনীর জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নবকুমার বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা করিবার করিয়াছি, তুমি যাহা ভাল বুঝ, পরে করিও।"

এক্ষণে নরেন্দ্রকুমার অনুজকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভাই, দুঃখ করিও না। যদিও পিতা তোমাকে তাঁহার বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, যদিও তোমার হস্তে কপর্দ্দক মাত্র নাই, তথাপি কখন তোমাকে আর্থিক কষ্টে পড়িতে হইবে না। আমার যাহা আছে, সমস্তই তুমি নিজস্ব ভাবিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।"

অবনী আর অধিক কথা কহিল না। প্রত্যুত বলা বাহুল্য, লোকে সেই দিন হইতে দেখিল, অবনীর স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কিছু দিনের পর, তাহার পূর্ব্বতন ভৃত্য চণ্ডী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিকারে বিপদ।

নরেন্দ্রকুমারের সংসারে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেই আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালিত ও নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদিত হইতে লাগিল। বিধবা পিসি সরলা সুন্দরী এখনও তাঁহার সংসারে গৃহকর্ত্রী। পত্নী নীহারকুমারী সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপিণী; সমবেত আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণের সুখ্যাতির পাত্রী, গৃহকর্ম্মে সরলা সুন্দরীর সহায়তাকারিণী, পতির আনন্দবর্দ্ধিনী ও হৃদয়তোষিণী।

যখন নবকুমারের মৃত্যু হয়, তখন নীহারকুমারীর অঙ্কে নবোদিতা দ্বিতীয়ার শশিকলার ন্যায় একটি দুই বৎসরের বালিকা,—নাম প্রভাতকুমারী। প্রভাতকুমারী শরদুৎফুল্ল প্রভাত-পদ্মবৎ সদা-প্রস্ফুটিত মুখ-পদ্ম লইয়া নীহারকুমারীর কোল হইতে নরেন্দ্রকুমারের কোলে ছুটিয়া যাইতেন, দেখিয়া পিতা-মাতার হৃদয় আনন্দ-নীরে আপ্লুত হইত।

দেখিতে দেখিতে আরও ছয় বৎসর অতীত হইল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। এখন প্রভাতকুমারীর বয়ঃক্রম আট বৎসর। নরেন্দ্রকুমারের আর অন্য সন্তানাদি হয় নাই। অবনীকুমার এখনও ভ্রাতার বশতাপন্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছে, ভ্রাতার বহু অনুরোধেও বিবাহ করে নাই,—বিবাহের নামে খড়্গহস্ত !

বোধ হয়, নরেন্দ্রকুমারের অন্য সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া, প্রভাতকুমারী পিতা-মাতার ও অপরাপর পুরবাসীর সমধিক যত্ন ও স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। প্রভাতকুমারীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা বয়সাধিক্য-সহকারে নীহারনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় দিনে দিনে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার বয়স আট বৎসর হইলেও শরীরের গঠন ও বর্দ্ধিতায়তন দৃষ্টে সকলেই তাহাকে দশ বা ততোধিক বয়সের বলিয়া অনুমান করিত। যখন আমাদের প্রভাতকুমারী নীলাম্বরে হেমাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, তরঙ্গায়িত অলকগুচ্ছ পৃষ্ঠে আলুলায়িত রাখিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, সঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে উপবনে খেলা করিত, যখন মধুর-আস্যে মধুর-হাস্য তুলিয়া, মুক্তাপ্রতিম দশন বিকাশ করিত, যখন ইন্দীবরনিন্দী বিশালনেত্রে সংসার-ভাবশূন্য সরলদৃষ্টি সঞ্চালন করিত, তখন বোধ হইত, বনদেবী বনরাজ্য ছাড়িয়া, নরেন্দ্রকুমারের পুষ্পবনে বালিকারূপে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার প্রভাত যখন নীল-অম্বরে সর্ব্বাবয়ব আবৃত করিয়া, বঙ্গীয় বধূর অনুকরণোদ্দেশে অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি হাসিত, তখন বোধ হইত, তারাবল্লভ আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে নীলগগনে নীলমেঘের ভিতর হইতে বাহির হইতেছেন। অন্তরাল হইতে

কন্যার এই অনুপম-রূপলাবণ্য এবং বাল্যক্রীড়া দেখিয়া, পিতা-মাতা সুখে হাস্য করিতেন।

নরেন্দ্রকুমার বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ-পরায়ণ ও ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তুর শিকারে বড়ই উৎসাহপূর্ণ। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তাঁহাকে দেখিতে হইত; সুতরাং শিকারে যাইবার আদৌ অবসর পান নাই। এই বৎসর সুযোগ পাইয়া শিকারে যাইতে মনস্থ করিলেন; শড়্‌কি বন্দুক, বর্ষা, ঢাল, তলোয়ারধারী পঁচিশ জন লোক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য সজ্জিত হইল।

বিক্রমপুরের পর একটী অনতিবিস্তৃত প্রান্তর। তাহার পরই নালন্দার ক্ষুদ্র পল্লী। তাহার পরেই বহুবিস্তৃত অরণ্যরাজি নানাজাতি বন্যজন্তু দ্বারা পরিপূরিত। নরেন্দ্রকুমার স্বদলে নালন্দার বনে প্রবেশ করিলেন। অবনী বাড়ীতেই রহিল।

নরেন্দ্রকুমার বনভূমি বিমথিত করিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত পশুবধ করিলেন, ইহার মধ্যে একবারমাত্র আহারাদির জন্য ক্ষণিক বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বন্যবরাহ ও কয়েকটী বৃহদাকার হরিণ শিকার করিয়া, সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন, এমন সময় কৃতান্ত-করাল সহচর-সদৃশ একটি শার্দ্দূল লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নরেন্দ্রকুমারের সম্মুখে থাবা পাতিয়া বসিল। ব্যাঘ্রের বিকট গর্জ্জনে কানন-ভূমি নিনাদিত ও কম্পিত হইল। সাহসী নরেন্দ্রকুমার ব্যাঘ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। শার্দ্দূল আহত হইয়া ক্রোধ-ক্ষিপ্ত বিকট-গর্জ্জনে নরেন্দ্রের উপর লাফাইয়া পড়িল, পার্শ্বস্থ বর্ষাধারী একজন সবলে ব্যাঘ্রের বক্ষে আঘাত করিল।

ব্যাঘ্র পুনঃ আক্রান্ত হইয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বনমধ্যে লুকাইত হইল। নরেন্দ্রকুমার অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন, ইঙ্গিতমাত্র শিক্ষিত তুরঙ্গ ছুটিল; বহুদূর অনুসরণ করিয়া ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইলেন. তাঁহার নিক্ষিপ্ত আর একটি গুলির আঘাতে দুরন্ত জন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া অনুচরবর্গ নিকটে আসিল, মহানন্দে সকলে কোলাহল করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত। নিবিড় বনের নিবিড় ছায়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া আরও ভয়ঙ্কর। এরূপ সময়ে, এরূপ বিপদসঙ্কুল আরণ্যভূভাগে অধিকক্ষণ অবস্থান নিতান্ত নিরাপদ নয় ভাবিয়া, নরেন্দ্রকুমার অনুচরবর্গকে হতজন্তু সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক আনিতে আদেশ করিয়া, বনভূভাগ হইতে বহির্গত হইলেন। অরণ্যের বাহিরে আসিয়া একবার বহুবিস্তৃত, নানা জাতি আরণ্য-বৃক্ষ-সমাকুলিত, লতা-গুল্ম-বিতান-বিমণ্ডিত অরণ্য-রাজির সান্ধ্যদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। নিস্তব্ধ নীরব বনভূমি প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছে দেখিয়া, আশৈশবস্বভাবসৌন্দর্য্য-সন্দর্শন-আমোদী নরেন্দ্রকুমারের হৃদয়ে বিমল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া, বিরাটদৃশ্য দেখিয়া, বিক্রমপুরাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

এদিকে তাঁহার অনুচরবর্গ ব্যাঘ্র হরিণাদি সংগ্রহ করিয়া, হাস্যকৌতুকে শিকার-শ্রম বিদূরিত করিতে করিতে, নালন্দাকে বামে রাখিয়া, একটী বনপথ ধরিয়া, বাটির দিকে চলিল।

তাহারা বিক্রমপুরে আসিয়া দেখিল, নরেন্দ্রকুমার তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সকলে ভাবিল, বোধ হয়, তাহারা

তাঁহার অশ্বে আসিয়া থাকিবে, অথবা পথিমধ্যে অপর কোন স্থানে প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার বিলম্ব হইতেছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি নরেন্দ্রকুমার ফিরিলেন না। পুরবাসী সকলের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; অবনীকুমার এতক্ষণ বাড়ীতে ছিল না, কোথা হইতে আসিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে আর্দ্র। সে নরেন্দ্রকুমারকে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথা?"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেহ তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অশ্বরক্ষক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়! বড় বাবু কোথা? ঘোড়া আপনি আস্তাবলে আসিয়াছে, বাবুকে ত দেখিলাম না!"

সকলের সন্দেহ আশঙ্কায় পরিণত হইল, শিকার মাথায় উঠিল। অবনীকুমার ও অপরাপর সকলে অশ্বশালে যাইয়া দেখিল, আরোহীশূন্য অশ্ব স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সকলকে তথায় সমবেত দেখিয়া, তুরঙ্গ অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই অভাবনীয় ঘটনা অন্তঃপুরে পৌঁছিল। রমণীমণ্ডলে হাহাকার পড়িল। নীহারকুমারী বাণবিদ্ধা কপোতির ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আদরের কন্যা প্রভাতকুমারী মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল দেবর লক্ষ্মণ নীহারকুমারীকে সান্ত্বনা করিয়া সহোদরের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

অবনীকুমার, বৃদ্ধ দেওয়ানজি, কারকুন, আমলাগণ, বাটির অপরাপর ভৃত্য ও আত্মীয়গণ আলোকহস্তে নরেন্দ্রকুমারের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, তন্ন তন্ন করিয়া বিক্রমপুরের প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে এ সংবাদ পৌঁছিল।

তখন সকলে প্রান্তরের দিকে ধাবিত হইলেন, আলোক-হস্তে অশ্বের খুর চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা নালন্দার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিক্রমপুর ও নালন্দার মধ্যে একটি অনতিবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরের শেষভাগে অর্থাৎ নালন্দার উপকণ্ঠে একটি আম্রকানন। এই আম্রকাননের নিম্ন দিয়া গ্রামের জল নিঃসরণের নিমিত্ত একটি গভীর পয়ঃপ্রণালী। লোক-যাতায়াতের জন্য আম্রকানন হইতে প্রান্তর পর্য্যন্ত একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সাঁকো বা পোল।

ক্রমশঃ সকলে এই গোলের নিকটে আসিলেন। আলোকের ছটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল, "একি!" সকলে সেই দিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একজন লোক পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়া রহিয়াছে। সমবেত আত্মীয় ও ভৃত্যগণ, ধরাধরি করিয়া মৃতব্যক্তিকে উপরে তুলিল।

হতব্যক্তিকে হঠাৎ চেনা দায়। মুখাকৃতি অস্ত্রাঘাতে বিকৃত। দেহবর্ণ, পরিধেয়বস্ত্র শোণিতধারা ও পঙ্কে অনুলিপ্ত। অবনীকুমার কম্পিতহস্তে হতব্যক্তিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া রোদন করিতে লাগিল। হতভাগ্য নরেন্দ্রকুমার ঘাতকের গুপ্ত-ছুরিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বক্ষের বসন অপসৃত করিয়া দেখিলেন, কোন গুপ্তশত্রুর ভীষণ ছুরিকা তাহার সহোদরের হৃদয়-শোণিত পান করিয়াছে। মুখের চারিপাশে পাঁচ সাতটি অস্ত্রের আঘাত। সকলে আরও বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকট অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি যে সকল বহু মূল্যের দ্রব্যজাত ছিল, তাহার একটীও নাই। তখন কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নরেন্দ্রকুমার যখন বিক্রমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন অন্ধকারে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত ও এই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেওয়ানজির পরামর্শানুসারে সকলে প্রভুর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া, বিক্রমপুরের বাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরচারিণী রমণীগণের, বিশেষতঃ নীহারকুমারীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দন-রোলে বিক্রমপুরের জমিদারের সৌধরাজী পরিপূরিত হইয়া উঠিল। প্রভাতকুমারীর করুণকণ্ঠের কাতরধ্বনি শুনিয়া

পাষাণও শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পুরবাসিনীরা শত চেষ্টা করিয়াও নীহারকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় মুক্তবেণী ও শিথিলবসনা হইয়া, নরেন্দ্রকুমারের মৃতশরীরের উপর পড়িলেন। সরলাসুন্দরীও ধূলায় পড়িয়া হাহাকার করিতেছেন। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই শোকের তরঙ্গ—সেই দিকেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য! কে কাহাকে সান্ত্বনা করে—সকলের হৃদয়েই শোকের পূর্ণ-প্রবাহ! ঝটিকার প্রবল তাড়নে লতাগুল্ম বিটপীরাজী যেমন ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত এবং ভূপতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে, পুরবাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া ধরা-শয্যায় শুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে মোহে সকলেই আত্মহারা। বৃদ্ধ দেওয়ানজি কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া তাৎকালিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নরেন্দ্রকুমারের এই অপঘাতমৃত্যুতে আত্মীয়-স্বজনের কথা দূরে থাক, বিক্রমপুরের প্রত্যেক লোকের হৃদয় শোকমোহে অভিভূত হইয়াছিল। তাঁহার উদার চরিত্রে—দয়াদাক্ষিণ্যাদি সৎগুণে প্রজামাত্রেই বশীভূত ছিল। তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কখন কেহ তাঁহার মুখে একটী অহঙ্কারসূচক বাক্য শ্রবণ করে নাই। এরূপ সদাশয়, সৎপ্রকৃতি জমিদারের শোচনীয় অকালমৃত্যুতে যে প্রজাগণ দুঃখিত হইবে, তাঁহা আর আশ্চর্য্য নহে!

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইল। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, পুরবাসী আত্মীয়কুটুম্বের হৃদয় হইতে নরেন্দ্রকুমারের শোক ক্রমশঃ অপনীত হইল। সকলেই তাঁহাকে

এক প্রকার ভুলিল, দিনে দিনে তাঁহার স্মৃতি লোক-সাধারণের হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। হইল না কেবল অভাগিনী নীহার কুমারীর, আর তাঁহার দেখা দেখি প্রভাতকুমারীর। মাতার চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখিলেই কন্যার কোমলহৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উঠিত; মাতার গলা ধরিয়া বালিকা ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাঁদিত, কখন বা "মা আর কাঁদিস্ না" বলিয়া জননীকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইত। প্রভাতকুমারী এখন নীহার-কুমারীর জীবনের অবলম্বন; তাহার মুখ চাহিয়াই তিনি জীবন ধারণ করিতেছেন, সুতরাং কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া, মাতা বাহ্য শোক দমন করিতেন সত্য, কিন্তু ভূগর্ভস্থ উত্তাপের ন্যায় শোকের তীব্রদহনে তাঁহার হৃদয়-কানন দগ্ধীভূত হইয়া যাইত।

নবকুমারের দানপত্রের সর্ত্তানুসারে প্রভাতকুমারীই এখন এই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। অবনীকুমার ভ্রাতার মৃত্যু অবধি বৃদ্ধ দেওয়ানজির সহিত একমত হইয়া বিষয়কার্য্য দেখিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগিতা দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে নিঃস্বার্থ পরোপকারক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ বৃদ্ধ দেওয়ানজির চক্ষে তত ভাল বোধ হইত না, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

বিক্রমপুরের জমিদারীতে অবনীকুমারের কোনও স্বত্ব নাই; কেন না, দানপত্রের সর্ত্তানুসারে নরেন্দ্র-কুমারই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই বিষয় ভোগ করিবেন। অবনী কেবল সহোদরের স্নেহাধিক্য বশতই গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছেন, নচেৎ পিতার এমন ইচ্ছা ছিল না যে, ত্যাজ্যপুত্র অবনী কপর্দ্দকের

সাহায্য প্রাপ্ত হয়। পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া উদরান্নের সংস্থান তাঁহারপক্ষে দুরূহ ভাবিয়াই, তিনি দারপরিগ্রহে বিরত ও ভ্রাতার বশীভূত ছিলেন, অন্ততঃ লোকে এইরূপ বিবেচনা করিত; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কোন কামিনীর রূপলালসা সর্ব্বদা জাগরূক থাকাতে,তিনি পূর্ব্বোক্ত একটী কার্য্যের জন্যও কখন চেষ্টা করেন নাই। পিতা বর্ত্তমানে, যখন তিনি গোপনে নরেন্দ্রকুমারের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন, তখন নীহারকুমারী প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন এবং ঐকান্তিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে যত্ন ও সেবা করিতে কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই। নীহারকুমারী বয়ঃকনিষ্ঠ, সোদর-প্রতিম দেবরের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া, কথোপকথন করিতে কোনরূপ সঙ্কুচিত হইতেন না, কিংবা নরেন্দ্রকুমারও এরূপস্থলে ওরূপ কথাবার্ত্তা ও একত্রে বাস দূষ্য বিবেচনা করিতেন না; ইহার উপর তিনি জগৎকে আপনার নির্ম্মল চরিত্রের মধ্য দিয়া দেখিতেন। তিনি সকলকে আপনার মত বিশুদ্ধস্বভাব বিবেচনা করিতেন।

অবনীকুমারের পাপহৃদয়ে নীহারকুমারীর সহাস্য বদনের বিমল-ছায়া দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম তাঁহার দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিত, শেষে তাঁহার সরল আলাপে বিমুগ্ধ হইয়া রূপতৃষ্ণার কঠিন-আয়াস-শৃঙ্খল সাধে পায়ে পরিল। দুষ্ট মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "হয় নীহারকুমারী লাভ, না হয় শরীর পতন।"

দাদার অকৃত্রিম স্নেহ, অপরিমেয় ভালবাসা, স্বার্থ-বিসর্জ্জন একদিকে, অপরদিকে নীহারকুমারীর অতুল রূপরাশি, প্রফুল্ল-পঙ্কজবৎ মুখপদ্মে সরল বিমল হাসি। অবনীকুমার এখন কোন

দিকে যায়। প্রথমে ভাবিল, দাদা আমায় এত ভালবাসে, আমি কোন প্রাণে,দাদার প্রাণের প্রাণ নীহারকুমারীর সর্ব্বনাশ করিব। কিন্তু সে ভাব হৃদয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পরক্ষণে ভাবিল, সে যেরূপ পতিপরায়ণা, তাহাতে যে, সহজে আমার পাপ-প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে, এমন বোধ হয় না। অনেক কৌশল আবশ্যক এবং অর্থেরও প্রয়োজন, সুতরাং অগ্রে অর্থের চেষ্টাই কর্ত্তব্য। জগৎ স্বার্থপর, কে কার সুখের দিকে চায়! আমিই বা দাদার মঙ্গলের দিকে কেন চাহিব! যখন নীহারকুমারীকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তখন যেরূপে পারি, তাহাকে লাভ করিবই। ইহাতে পাপ হয়, হউক; পুণ্য হয়, হউক; অপরের স্বার্থ, জীবন, পার্থিবসুখ নষ্ট হয়, হউক; আমার দেখিবার প্রয়োজন কি! আবার ভাবিল, না—অনেক পাপ করিয়াছি, কুলনারীকে কলঙ্কিনী করিয়া, জীবনের পাপভার আর বাড়াইব না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপেক্ষা, পাপবাসনাতে তাহার হৃদয়ের স্থান সমধিক অধিকৃত হইয়াছিল, সুতরাং পাপবাসনারই জয় হইল। নীহারকুমারীকে অকূলে ভাসাইতে সঙ্কল্প করিল।

এই পাপাঙ্কুর হৃদয়ে প্রথম উদ্ভূত হইবার পর, প্রায় ছয় বৎসর গত হইয়াছে। নবকুমারের মৃত্যু ঘটিলে, আর তাহার গোপনে থাকিবার প্রয়োজন রহিল না, সুতরাং তাহাকে নরেন্দ্রকুমারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া, বাহিরে আসিতে হইল। তবে ইচ্ছা করিলে, বা আহারাদির সময় যে, একবারও অন্তঃপুরে যাইত না, এমন নহে। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকবার পাপবাসনাকে দূর করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিল;

এক্ষণে সহোদরের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার কলুষিত আশা সফল হইবার অনেক সম্ভাবনা ঘটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তদপেক্ষা আরও একটী ভীষণ-কল্পনা তাহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইল;—বিক্রম-পুরের বিপুল বিষয়ের আত্মসাৎ।

এ কল্পনা যে তাহার হৃদয়ে এই প্রথম উঠিল, এমন নহে; নৈদাঘ-গগনে চপলার ন্যায় অনেকবার তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে দেওয়ানজীকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিতে মনস্থ করিল; কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবিল, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। সরলাসুন্দরী কিংবা নীহারকুমারী কোনক্রমেই তাহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন না; সুতরাং তাহাকে উপায়ান্তর দেখিতে হইল। বৃদ্ধ, এক্ষণে তাহার পাপের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবার প্রথম কণ্টক। এ কণ্টক দূর করিতে না পারিলে, কোন আশাই ফলবতী হইবে না।

এইরূপ চিন্তার কয়েক দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অবনী এবং তাহার প্রিয়তম ভৃত্য, উদ্যান-বাটীকার পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল।

চণ্ডী চাঁড়ালের ছেলে;—ডাকনাম চণ্ডে চাঁড়াল, তিনিই এখন অবনীকুমারের পরামর্শদাতা, পরমসুহৃদ।

অবনীকুমার বসিয়াছিল, এক্ষণে দাঁড়াইয়া, চণ্ডীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "যা বল্‌ছিস, সব সত্য—কিন্তু ঐ বুড় বেটাকে আগে না সরাইতে পারিলে, কোন কার্য্যই সফল হইবে না।"

"চণ্ডীও হাসিয়া কহিল, "তাহার জন্ত আর ভাবনা কি; শেষ

পর্য্যন্ত আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই হইল। আপনার অনুগ্রহের উপরই সব নির্ভর করে।"

অবনীকুমার পুনরায় তাহার পৃষ্ঠদেশে আদরে হাত বুলাইয়া কহিল,—"নগদ চক্‌চকে পাঁচ হাজার! কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই যেখান হইতে পার, সেই দ্রব্যের যোগাড় করিতে হইবে।"

চণ্ডী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উঠিল। অবনীও ভাবিতে ভাবিতে, অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল। নীহারকুমারীর সহিত জমিদারী-সংক্রান্ত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল, শেষে উঠিবার সময়ে, সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পাপ-মুখে পাপ-কথা বাহির হইল না। সরলা নীহারকুমারীও তাঁহার পাপ-অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

প্রভ্যুত বলা বাহুল্য, পর দিন প্রাতঃকালে চণ্ডে চাঁড়াল আসিয়া, হাসি হাসিমুখে অবনীকুমারকে এক বিরাশী সিক্কা ওজনের ছেলাম ঠুকিল। অবনীকুমার বুঝিল, কার্য্য সফল হইয়াছে। চণ্ডে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কাগজে মোড়া কি একটী পদার্থ বাহির করিয়া, তাহার হস্তে দিল। অবনীকুমার তৎপারবর্ত্তে চারিটী রজত মুদ্রা প্রদান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাপিনী।

দেওয়ানজির নিবাস বৈকুণ্ঠপুর,—বিক্রমপুরের সাত ক্রোশ দক্ষিণ। জমিদার মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণে তাঁহার একখানি অট্টালিকাও আছে। বহু দিবস বিক্রমপুরে কার্য্য করিতেছেন, সেই কারণে এখানেও বসতবাটী, জমি প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছেন। বিক্রমপুরের বাটীতে অধিক লোক-জন ছিল না, কেবল তাঁহার স্ত্রী, কনিষ্ঠ পুত্র, একটী ভৃত্য ও বিমলা নাম্নী দূর-সম্পর্কীয়া একটী সজাতীয়া পাচিকা।

এই বিমলার সহিত আমাদের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে; সুতরাং তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।

বিমলার পিতা নিমাইচাঁদ সরকারের নিবাস বিল্বগ্রাম। নিমাইচাঁদ সম্পর্কে দেওয়ানজির খুল্লতাত হইতেন। বিমলার

বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। বিমলাদের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, সুতরাং নিমাইচাঁদের মৃত্যুর পর, তাহাদের বড়ই সাংসারিক-কষ্ট উপস্থিত হয়। দেওয়ানজি তাহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিতেন এবং বিমলার স্বামীও সাধ্যমত সহায়তা করিতে ক্রটী করিতেন না।

বিমলার কপাল বড় মন্দ। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাহার স্বামীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। শ্বশুরবাড়ীর অবস্থাও তদ্রূপ। বিমলার মাতা তাহাকে বিল্বগ্রামে লইয়া আসিলেন। অতি কষ্টে মাতা ও কন্যার দুঃখের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এইরূপে আরও পাঁচ বৎসর গত হইল। বিমলার মাতা, শোক-দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে, সাত দিনের জ্বরে চক্ষু মুদিলেন। বিমলার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিল না।

বিমলার অতুল রূপ, চাঁদপানা মুখ, চলচলে পদ্মের মত চোখ দুটী, পিঠভরা কাল কাল ঢেউখেলান চুলগুলি বিমলার কাল হইল। হৃদয়-ভরা যৌবন, হেলে দুলে মুচকে হেসে চলন, বাঁকা-চোখের বাঁকা-দৃষ্টি বিমলার সর্ব্বনাশ করিল। বিল্বগ্রামের ঘাটে, মাঠে, বৈঠকখানায়, বকুল গাছের তলায় ঐ কথারই তোলা-পাড়া হইতে লাগিল। বিল্বগ্রামের বয়স্থারা বিমলাকে কথায় কথায় ভৎর্সনা করে, নবীনারা অপরকে লক্ষ্য করিয়া, টিট্‌কারীর মর্ম্মভেদী শর ছোড়ে। বিমলা এখন যায় কোথায়? তাহারই বা দোষ কি? যত দোষ, বিমলার যৌবনের—রূপের ত বটেই!

এ পর্য্যন্ত বিমলার চরিত্রে কোন দোষ ঘটে নাই। পূর্ণ যৌবনা, অনাথা বিমলা সর্ব্ব প্রযত্নে আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। সম্মুখে প্রলোভনের শতচিহ্ন বর্ত্তমান,—বিমলার গ্রাহ্য নাই। কু-লোকের কুদৃষ্টি বিমলার হৃদয়কে চঞ্চল করিতে পারে নাই। বিমলা সাবিত্রীর মত সতী হইলেও এরূপ অবস্থায়, লোকে তাহার নানারূপ কলঙ্ক রটাইল। পাড়ার গৃহিণীরা বলেন, "মা! একটু ভাল ক'রে রাস্তায় চলিও। অমন ক'রে লোকের দিকে চেয়ে হেস না।"

বিমলার কি সাধ যে, সে ইচ্ছা করিয়া লোকের কথা শোনে। বিমলা ইচ্ছা করিলেও, ভাল করিয়া চলিতে পারে না। যৌবনভরে দ্রুত চলিতে পারে না, শত চেষ্টা করিলেও পোড়ার মুখে হাসি আসে। বিমলা বিরলে বসিয়া কাঁদে, মনে মনে ভাবে, "এ রূপকে কি কোন প্রকারে নষ্ট করিবার উপায় নাই?"

শেষে, বিমলার উপর নানারূপ অত্যাচার হইতে লাগিল। সে বৈকুণ্ঠপুরে দেওয়ানজির নিকট গিয়া, তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। তিনি তাহাকে কহিলেন, "তুমি বিল্বগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া, আমার সংসারে থাক, তোমার কোনরূপ কষ্ট হইবে না।" সেই অবধি, বিমলা দেওয়ানজির আবাসেই আছে। দেওয়ানজির পত্নী বিমলাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। বিমলা নামে মাত্র পাচিকা।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে, বিমলা দেওয়ানজির বিক্রমপুরের আবাসে আসিয়া বাস করিতেছে।

মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়দমন করা বড়ই কঠিন। আজ

যে ব্যক্তি দেবোপম বিমল-চরিত্র, সকলের আদর্শস্বরূপ, কাল সেই ব্যক্তিই, রিপুর বশীভূত হইয়া, কামতরঙ্গে পড়িয়া আপনাকে পশুবৎ প্রতীয়মান করিতেছে।

বিল্বগ্রামে থাকিতে, যে বিমলা, কন্দর্পের প্রবলতাড়ন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছায় প্রণয়প্রার্থীদিগের রসালাপে উপেক্ষা করিয়া, আপনার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল, সেই বিমলাই; আজ অবনীকুমারকে দেখিয়া, বিমল-হৃদয়ে পাপের সিংহাসন পাতিতে ব্যাকুলা হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেওয়ানজীর বাটী, জমিদার-বাটীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত অর্থাৎ পুষ্পোদ্যান-সংলগ্ন। মধ্যে একটী দ্বার, প্রায়ই বন্ধ থাকে, বিশেষ কার্য্য থাকিলে খোলা হয়।

প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময়, অবনীকুমার উপবনে ভ্রমণ করেন; মধুকরের মনে ব্যথা দিয়া, বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ-বেলের তোড়া বাঁধেন, স্ফটিক-সলিল-তড়াগের বাঁধাঘাটে বসিয়া, মাছের খেলা দেখেন, আর বিমলা গোড়াবমুখী ছাদে দাঁড়াইয়া, অবনীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। অবনী প্রজ্জলিত অনলরাশি,—বিমলা পতঙ্গ,—তাহাতে ঝাঁপ দিতে ব্যাকুলা হইল।

এইরূপে কিছুকাল গত হইল। সহসা বিমলার সহিত অবনীর চারি চক্ষের মিলন হইল;—বিমলা মরিল।

প্রথমতঃ অবনী অত গ্রাহ্য করিত না; তাহার হৃদয়ে বিমলাকে রাখিবার আর স্থান নাই; তাহার হৃদয় এখন নীহারকুমারীময়। কিন্তু অবনী তাহাকে হস্তগত করিতে মনস্থ করিল। কার্য্যও সহজে সফল হইল।

নিশীথরাত্রিতে বিমলা প্রায়ই নির্দ্ধারিত সময়ে অবনীর সহিত সাক্ষাৎ করিত, আজিও করিল। অপরাপর দিন অপেক্ষা আজি আদরের অভিনয় কিছু অধিক হইল। বিমলা কুলটা হইলেও সরলা, অবনীর অসদভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সরলপ্রাণের সরলবিশ্বাসে অবনীকে ভালবাসে, এখন সে অবনীর জন্য মরিতেও কুণ্ঠিত নহে। বিমলা যদি চতুরা হইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, তাহার প্রতি অবনীর ভালবাসা কিছুমাত্র নাই, সমস্তই স্বার্থ-সাধনের ছল মাত্র।

আজি হঠাৎ অবনী, বামকরে বিমলার দক্ষিণ-কর-পল্লব লইয়া, দক্ষিণহস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া, সোহাগভরে কহিল, "বিমলা! আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, তুমি আমায় তেমন ভালবাসিতে পারিলে না।"

বিমলা প্রণয়-পাত্রের মুখে আজি অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ কিছু বিমর্ষ হইল. পরে ধীরে ধীরে কহিল, "রমণীর ভালবাসা অন্তরেই থাকে, ইহার অধিক প্রকাশ করিতে পারে না।" পরে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্রতাসহকারে কহিল, "কেন অবনী. আজ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আমার ভাল-বাসা নাই, কিসে জানিতে পারিলে?"

অবনী হাসিয়া কহিল, "রমণীর মনের কথা পাওয়া বড়ই দুষ্কর। তাহারা মুখে একরূপ বলে, তাহাদের মনে অন্যরূপ থাকে। তোমাদের কি অন্ত পাবার যো আছে চাঁদ।" এই বলিয়া, অবনী বিমলার গণ্ড দুইটী সোহাগে টিপিয়া ধরিল। —তাহার পর কি হইল, না বলিলেই ভাল হইত—দুইজনার

উষ্ণ অধরোষ্ঠ পরস্পর সম্মিলিত হইল। বিমলা আদরে গলিয়া গেল; টানা টানা, ভাসা ভাসা চোখের কোণে জল আসিল। অধোবদনে কহিল, "কি করিলে তুমি জানিতে পারিবে, আমি তোমায় ভালবাসি? আমি মরিলে কি, তুমি সুখী হও?"

অবনী পুনরায় বিহ্বলা বিমলার অধর-প্রান্ত অধরে চাপিয়া কহিল, "একটি কাজ বলিব, যদি পার, বুঝিব, তোমার ভালবাসা প্রাণের; নহিলে সমস্তই মুখের।"

বিমলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বল, কি করিতে হইবে?" অবনী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তোমার সাহস হইবে না, তুমি বড় ভীতু।" বিমলা বলিল, "পারিব না, এমন কি কাজ? যা পারিবার নয়, তাহাই পারিয়াছি।"

"তবে শোন" বলিয়া অবনী বক্ষের মধ্য হইতে, কাগজ মোড়া কি একটা পদার্থ বাহির করিয়া, অবিকৃতস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, "কাল রাত্রে যখন দেওয়ানজিকে আহার করিতে দিবে, তখন তাঁহার দুগ্ধের সহিত এই জিনিষটা মিশাইয়া দিও; খুব সাবধান, যেন কেহ না দেখে।"

বিমলার মুখে পাংশুবর্ণের ছায়া পড়িল। তাহার মনে এক ঘোর সন্দেহ জন্মিল, কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অবনী! এ কি! বিষ ত নয়? তোমার জন্য সব করিতে পারি, নিজে মরিতে পারি, অপরের প্রাণের হানি করিতে পারিব না।"

অবনী বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "পাগল আর কি! দেওয়ানজি আমার এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে মারিয়া পাপ করিব। তিনি না আমাদের বিষয়ের তত্ত্বাবধারক? তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ নাই।"

তবুও বিমলার মন বুঝিল না। মনে যেন কেমন একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে এ কি?"

অবনী কহিল, "কি তবে শুনিবে? দেওয়ানজির মাথার ব্যারাম হইয়াছে, শুনিয়াছ ত?"

বিমলা কহিল, "হঁা, অনেক কবিরাজ দেখিয়াছে, কোন ফল হয় নাই বলিয়া, আর তিনি কাহাকেও দেখাইতে চাহেন না।"

অবনী বলিল, "সেই জন্যই ত এত কাণ্ড। তাঁহার ব্যারাম বাড়িলে, আমাদের বিশেষ ক্ষতি, কাজেই যাহাতে তাঁহার পীড়ার উপশম হয়, আমাদিগকে তাহার চেষ্টা পাইতে হইবে। আমি কবিরাজের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া, এই ঔষধ লইয়াছি, দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে।"

বিমলা এইবার সমস্ত বুঝিল। ঔষধটী অবনীর হাত হইতে লইয়া বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিল।

* * * * * *

পরদিন সন্ধ্যার পর, দেওয়ানজি আহারে বসিলেন। বিমলা অন্যান্য দিবসের ন্যায় আজও নিকটে রহিল। দেওয়ানজির অজ্ঞাতে বিমলা দুগ্ধের সহিত মাথার পীড়ার, সেই সাদা-সাদা ঔষধের গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইল। যদিও সে প্রণয়ীর কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, তথাপি দুধের বাটী দেওয়ানজির সম্মুখে ধরিবার সময় তাহার হস্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কে যেন তাহার কানে কানে কহিল, "পাপিনি! করিলি কি! অসময়ের আশ্রয়দাতাকে কালকূট ভক্ষণ করিতে দিলি।"

বিমলার চমক ভাঙ্গিল। ভাবিল, "হায়! হায়! করিলাম কি! অন্নদাতা—যাহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, তাহাকে বিনাশ

করিলাম।" পরক্ষণেই মনে হইল, "না, অবনী দেবপ্রকৃতির লোক, তাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া অসম্ভব।"

দেওয়ানজি অসন্দিগ্ধচিত্তে ঔষধ-মিশ্রিত দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিলেন। বিমলা সন্দেহান্দোলিত-প্রাণে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; কালকূট ভক্ষণের কোন ফল ফলিল না। বিমলা কিছু সুস্থ হইল।

দেওয়ানজি আহারের পর উপরে উঠিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলেন, "বোধ হয়, পানে কাঁচা সুপারি ছিল, তাই মাথাটা কেমন ঘুরিতেছে।" এই বলিয়া উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া, অর্দ্ধ-শায়িতভাবে শয্যায় উপবেশন করিলেন।

বিমলার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল। প্রভাত-পবনে কদলি-পত্রের ন্যায়, তাহার শরীর থর থর করিয়া, কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "আমার শরীর কেমন করিতেছে, চোখে যেন ঘোলা পড়িতেছে, কেন এমন হইল? বিষ ত ছিল না?"

বিমলা মনে মনে বলিল, "ছিল বই কি?" বিমলার এখন উভয় সঙ্কট, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

দেওয়ানজির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইল, হস্ত পদ অবসন্ন হইয়া আসিল, উপাধান হইতে মাথা নীচে গড়াইয়া পড়িল। গৃহিনী 'কি হইল' বলিয়া, ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; পাপিনী বিমলা বুঝিল, তাহার পাপের বৃক্ষে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হায়, হায়! করিলাম কি!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরের মা।

দেওয়ানজির মৃত্যুর পর, অবনীকুমার প্রভাত-কুমারীর পক্ষ হইয়া, তাঁহার বিষয়াদি রক্ষা করিতে লাগিল। দেওয়ানজির আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকে সন্দিহান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অবনীর উপর কোন সন্দেহ পড়ে নাই।

বিমলার মনে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মনে এখন দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই, দেওয়ানজির হত্যার প্রধান কারণ। যে অবনীকে তাহার দেবতুল্য, বিমল-স্বভাব বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহার এই প্রকার আচরণে বিমলা মরমে মরিয়া গেল। প্রণয়ীর প্রতি তাহার দারুণ অভিমান জন্মিল; তাহার সহিত কয়েক দিন সাক্ষাৎ করিল না। অবনীকুমার তাহাতে বড় ক্ষতি বিবেচনা করিল না; কারণ, যে জন্য বিমলার প্রতি ঐত ভালবাসার অভিনয়, সে কার্য্য ত সমাধা

হইয়াছে। আর বিমলাকে প্রয়োজন কি? কিন্তু বিমলার যে, তাহাকে প্রয়োজন—সে কথা, সে বোঝে কই!

অবনীকুমার এখন প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল! তাহার গর্হিতাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া, একে একে পুরাতন ভৃত্য সকল পলায়ন করিতে লাগিল এবং তাহার মনের মত ভৃত্য সকল তাহাদের স্থান পূরণ করিল।

আত্মীয় কুটুম্বেরাও আপন আপন মান লইয়া, একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, দেওয়ানজির মৃত্যুর পর, মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতে, জমিদার বাটীর বিষম বিপর্য্যয় ঘটিল। এককালের বহুজনাকীর্ণ, কোলাহলপূর্ণ, প্রশস্ত অট্টালিকাশ্রেণী ক্রমশঃ নীরব, নিস্তব্ধ হইয়া, বিভীষিকা জাল বিস্তার করিতে লাগিল।

একদিন নীহারকুমারীকে নিভৃতে পাইয়া, অবনীকুমার পাপ-হৃদয়ের পাপ-বাসনা ব্যক্ত করিল। নীহারকুমারী কুপিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। উপযুক্ত লক্ষ্মণ-দেবর গতিক মন্দ বুঝিয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

এই ঘটনার পর, উভয়ের মধ্যে আর ৫।৭ দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। অবনীকুমার দেখা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অষ্টম দিনের দিন, সন্ধ্যার সময় নিহারকুমারী নিজ কক্ষে বসিয়া, আপন মনে কি ভাবিতে-ছেন, এমন সময়ে পদশব্দে পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, অবনীকুমার দণ্ডায়মান। নীহারকুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া, অকম্পিত

স্বরে কহিলেন, "সত্যই তুমি কুলের কলঙ্ক জন্মিয়াছ। তোমার মত পাপিষ্ঠ, ইহার পূর্ব্বে, আর কখন ভদ্রবংশে জন্মে নাই। যদি তুমি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। আমি তোমার মাতৃসমা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া, যদি আমার প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার কর, তাহা হইলে, তোমার পরিণাম বড় সুখের হইবে না।"

অবনী এ কথার অর্থ বুঝিল। সে জানিত, নীহারকুমারী ইচ্ছা করিলে, এইক্ষণেই তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন; কারণ তিনি ত্যজ্যপুত্র, বিষয়ে কোন অধিকার নাই! কিছুক্ষণ অধোবদনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার অপরাধ মাপ কর,—আমি তোমার প্রতি আর কখন অত্যাচার করিব না, কিন্তু এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না।"

নীহারকুমারী আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "না।"

অবনী প্রস্থান করিল। নীহারকুমারী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এই ঘটনার চারি দিবস পরে, একদিন মধ্যাহ্নসময়, এক নীচবংশীয়া প্রৌঢ়া অন্তঃপুরে নীহারকুমারীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। নীহারকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

প্রৌঢ়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র খুলিতে খুলিতে, বলিতে লাগিল, "ওমা! তুমি আমাদের ভুলিয়া গেছ, আমাদের বাড়ী নিতাইগ্রামে—আমি হরের মা।"

এই বলিয়া, হরের মা পত্রখানি নীহারকুমারীর হাতে দিল। নিতাইগ্রামে নীহারকুমারীর পিত্রালয়। বলা বাহুল্য,

তিনি হরের মাকে কখন দেখেন নাই, কারণ বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরগৃহে বাস করিতেছেন। মনে করিলেন, হবেও বা, আমি হরের মাকে চিনি না। বাপের বাড়ীর লোক পাইলে, স্ত্রীলোকদিগের আহ্লাদের সীমা থাকে না। নীহার-কুমারী তখন পত্র না খুলিয়াই, তাহাকে হাজারখানেক প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, সেও তাহার যথাযথ উত্তর দিল;—তাঁহাদের বাড়ীর কাঁঠাল গাছটীতে কাঁঠাল ফলিতেছে কি না, তাঁহার বড় ভায়ের পরিবার আর অন্তঃসত্ত্বা কি না, বকুলফুলের স্বামীর সহিত তাহার কি রকম ভাব হইয়াছে, মনে রাখার স্বামী মদ ছাড়িয়াছে কি না, ও পাড়ার মিত্রদের মেজবউ স্বামীর নিকট শুইতে যাইবার সময় আর কাঁদে কি না, ইত্যা-কার প্রশ্ন চলিতে লাগিল। শেষে পত্র খুলিয়া বলিলেন, "মা'র অসুখ, কৈ, এতক্ষণ আমায় বলিস্ নাই।"

হরের মা কহিল, "চিঠিতে লেখা আছে, কি আর বলিব। তোমার মা তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি বুড়ো হইয়াছেন, আর যে বেশী দিন বাঁচিবেন, সে আশা নাই। তাঁহাকে একবার দেখিতে চল, কত দিন বাপের বাড়ী যাও নাই।"

নীহারকুমারী জননীর জন্য কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিলেন। পরে সরলার সহিত পরামর্শ করিয়া, পর দিন প্রভাতেই নিতাইগ্রামে যাওয়া স্থির করিলেন।

হরের মা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এদিকে নীহারকুমারী পিতৃভবনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিধবা হইবার পর আর তিনি নিতাইগ্রামে

যান নাই, মা'র সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কাঁদিবেন, অতীত ঘটনা আবার তাঁহার অভিনব হইবে, ভাবিয়া, তাঁহার মর্ম্মে বিষম আঘাত লাগিল।

সরলাসুন্দরী অবনীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমাকে লইতে লোক আসিয়াছে, তাহার মা'র বড় অসুখ। একখানি নৌকা ঠিক কর, কাল প্রভাতেই উহারা যাত্রা করিবে।"

অবনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউ একা যাইবেন, না—প্রভাত-কুমারীও যাইবে?"

সরলাসুন্দরী কহিলেন, "দুজনেই যাইবে।"

নৌকা প্রস্তুত, নীহারকুমারী কন্যাকে লইয়া, যথাসময়ে নৌকা আরোহণ করিলেন। হরের মা উপরে উঠিলে, নৌকা খুলিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চক্রী-চক্র।

ঠিক! আশ্চর্য্য হইতে পারেন, নীহারকুমারী অত বড় ঘরের বউ, তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীর বিপুল বিষয়, তিনি বাপের বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে বাপের বাড়ীর প্রেরিত লোক ভিন্ন আর কেহই যাইল না। বাড়ীতে চাকর-চাকরাণীর ত অভাব নাই, তাহারা কেহ সঙ্গে যাইল না কেন? আশ্চর্য্য হইবার কথা বটে, কিন্তু নীহারকুমারীর পিত্রালয়ের অবস্থা ভাল নয়। তিনি শ্বশুর বাড়ীর লোক সঙ্গে লইয়া যাইতে, রাজী নন।

নৌকাপথে বিক্রমপুর হইতে নিতাইগ্রামে যাইতে হইলে, প্রাতে যাত্রা করিলে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌছান যায়। নীহার কুমারী ভাবিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সুতরাং অপর রক্ষী-লাঠিয়ালাদি লইয়া যাওয়া তত প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

আমাদের প্রভাতকুমারী ইতিপূর্ব্বে আর কখন জলযানে আরোহণ করেন নাই। তিনি নৌকার ভিতর বসিয়া, নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। প্রভাত-সমীরণে নৌকা হেলিতে দুলিতে—নাচিতে নাচিতে, চলিতে লাগিল। তীরে বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্লব, শর-পাতা শস্যের শিষ আন্দোলিত এবং প্রভাতকুমারীর তরঙ্গায়িত অলকাগুচ্ছ ও শিথিল বসনপ্রান্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বলাকা, সারস, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষী দলে দলে খাদ্যান্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে; বালিকা তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিল। নীহারকুমারী নিবিষ্টমনে প্রিয়জন-সমাগম-সুখ ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছেন, আর হরের মা আপন ভাবনাতেই ব্যাকুল। দাঁড়ি-মাঝিরা আপন আপন কাজে নিযুক্ত।

ক্রমশঃ বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইতে চলিল। হরের মা কহিল, "উপরে বাজার আছে, কিছু খাদ্য দ্রব্য আনি, আহারের যোগাড় কর। বেলা অনেক হইয়াছে, ক্ষুধায় তোমাদের মুখ শুখাইয়া গিয়াছে।"

নীহারকুমারী খাদ্যসামগ্রী এক প্রকার সকলই আনিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা প্রভাতকুমারী ও আপনার আহার কার্য্য সমাধা করিলেন। নৌকা-চালকেরা এবং হরের মাও ভোজন করিল। নৌকা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর, তখন দূর হইতে নদীর তীরেই প্রান্তরের মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অট্টালিকার শীর্ষদেশে প্রভাতকুমারীর নয়নদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রভাত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! মাঠের মাঝখানে ও কার বাড়ী?"

নীহারকুমারী কন্যার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"কি করিয়া বলিব মা! বোধ হয়, কাহার বাগানবাটী—উপরে গ্রাম থাকিতে পারে।"

হরের মা মাতাপুত্রীর কথোপকোথন শুনিয়া কহিল,-"নৌকা লাগাইতে বলিব? উপরে উঠিয়া দেখিবে? এখানে ত আর কেহ নাই, চারিদিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ কর্‌তেছে।"

প্রভাতকুমারী বালিকা-সুলভ-কৌতূহল-বশতঃ সাগ্রহে কহিল, চল না মা! দেখিয়া আসি।"

নীহারকুমারী কন্যার আগ্রহ দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাড়ীর আবার কি দেখিবে মা! মাঠের মাঝে আর নামিয়া কাজ নাই।"

নীহারকুমারীরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিক্রমপুরের মাঝিরা রহিয়াছে, তিনি সেই গ্রামের বউ, তাহাদের সাক্ষাতে নৌকা হইতে নামিয়া, উপরে অপরের বাড়ী দেখিতে যাওয়া, তত ভাল বিবেচনা করিলেন না। শেষে কন্যার উপরোধে পড়িয়া কহিলেন,—"তবে তুই হরের মায়ের সহিত যা।" প্রভাতকুমারী হাতে আকাশের চাঁদ পাইল। নৌকা তীরে লাগান হইলে, হরের মা ও প্রভাতকুমারী তীরে অবতরণ করিল। নীহারকুমারী নৌকাতেই রহিলেন।

প্রভাতকুমারী উপরে উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে এক ক্রোশ বা ততোধিকের মধ্যে লোকের বসতি নাই। একদিকে জঙ্গল আর দুইদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল ধান্যক্ষেত্র; চতুর্থ দিকে নদী ও তাহার অপর পার্শ্বে জঙ্গলাদি। অট্টালিকার চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এরূপ স্থলে এরূপ নির্জ্জনে

অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করিল এবং কি উদ্দেশেই বা নির্ম্মিত হইয়াছে, জানিতে প্রভাতের বড়ই কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু হরের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্তোষ জনক উত্তর পাইল না।

প্রভাতকুমারী অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া, বাড়ীখানি দেখিল। তাহাতে কোন লোক বাস করে, তাহার এমন বোধ হইল না। বাটীর দ্বারের নিকট যাইয়া দেখিল, দ্বারে চাবি বন্ধ। নির্জ্জন বহুবিস্তৃত প্রান্তরে, হরের মায়ের সহিত কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, তাহার মনে কেমন এক প্রকার ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রভাত সঙ্গিনীকে কহিল, "চল হরের মা! নৌকায় যাই, মা একা আছেন।"

হরের মা কহিল, "বাড়ীর ভিতর না দেখিয়াই যাইব?" প্রভাতকুমারী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার এ প্রকার হাসির কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, পুনরায় কহিল, "চল না, আমার বড় ভয় পাইতেছে।"

তথাপি হরের মা যায় না, বিলম্ব করে দেখিয়া, প্রভাত-কুমারী তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর তীরে আসিয়া প্রভাতকুমারী দেখিল, নৌকা নাই। ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া কহিল,—"সে কি হরের মা! নৌকা কোথা গেল? মা কোথা গেল?" চক্ষে শত ধারা ঝরিল—হাঁপ ছাড়িয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হরের মাও যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল,—"তাই ত, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! হায় হায়! কি হইল। বোধ হয়, ডাকাত আসিয়া থাকিবে। চল, চল, আমরা প্রাণ লইয়া পলাই।" প্রভাতকুমারী ডাকাইতের নাম শুনিয়া, আরও ভীত হইল। সরলা বালিকা, হরের মায়ের হস্ত ধরিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল,—"হরের মা। কি হবে—বনের মাঝে কি করে রক্ষা পাব—মার দশা কি হবে? কেন মরিতে নৌকা হইতে নামিলাম!" হরের মা কহিল,—"চল, আমরা ঐ বাড়ীর মধ্যে যাই, নহিলে ডাকাত আসিয়া, আমাদিগকেও মারিয়া ফেলিবে।"

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কহিল,—"তবে তাই চল, বাড়ীর চাবি কোথা পাবি?"

হরের মা কহিল, "চাবি আমার কাছেই আছে।" প্রভাতকুমারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, হরের মা তাহার হাত ধরিয়া, বাড়ীর নিকট লইয়া গেল, বস্ত্রপ্রান্ত হইতে চাবি লইয়া, দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক, ভীতা বালিকাকে, বাড়ীর মধ্যে পূরিয়া, ভিতর হইতে অর্গল আঁটিয়া দিল। প্রভাতকুমারী মনে করিল, ডাকাইতের হস্ত হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বালিকার ভয় কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। বাটির মধ্যে কৃষিকার্য্যের উপযোগী সকল প্রকার দ্রব্য দেখিয়া, তাহার মনে হইল, বোধ হয় এটী কাহারও গোলাবাড়ী। নিম্নে গোরক্ষণের কয়েকটী সামান্য অবস্থার ছোট কুঠারী এবং একটি অপেক্ষাকৃত

বৃহদাকার রন্ধনশালা। অপরাংশে দুইটী কূপ ও খাদ্যাদি রক্ষণোপযোগী গোলা প্রভৃতি। এই অংশের দ্বিতলে কেবল একটীমাত্র কক্ষ।

প্রভাতকুমারীকে নীচে রন্ধনশালায় বসিতে বলিয়া, হরের মা দ্বিতলের ছাদে উঠিল। প্রভাতকুমারী তাহার সঙ্গে যাইতে ছিল, কিন্তু সে তাহাকে যাইতে দিল না। সহসা প্রভাতের মনে এক বিষম সন্দেহের আবির্ভাব হইল। কিছু পূর্ব্বে হরের মা বলিয়াছিল, এ বাড়ী কাহার, সে জানে না, কিন্তু পরক্ষণেই বাটীতে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারের চাবি কোথা হইতে পাইল। তাহার ভাবে বোধ হইতেছে, এ বাটীর বিষয় সে ভালরূপই জানে। কি নিমিত্তই বা ছাদে উঠিল এবং তাহাকেই বা সঙ্গে লইল না কেন? আর এক বিষয় তাহার মনে পড়িল ;—নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলে, সে হাসিয়াছিল এবং বলিয়াছিল,—"বাটীর ভিতর না দেখিয়াই যাইব?" এ সকল বিষয়ে পূর্ব্বে তাহার কোনরূপ সন্দেহ জন্মায় নাই, কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত ঘটনাগুলি যতই একত্রে গ্রথিত করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, "এ হরের মা কে?"

তাহাকে আর অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না। প্রৌঢ়া হাসিতে হাসিতে, তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, "এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ, তুমি কোথায় আসিয়াছ?" প্রভাত-কুমারীর চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একখানি কুয়াশার আবরণ অকস্মাৎ অপসারিত হইল ; বালিকা নূতন আলোকে, নূতন চক্ষে হরের মায়ের নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহারা যে

কোন চক্রির ঘোর চক্রান্তজালে বিজড়িত হইয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। ভয়ে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রৌঢ়ার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আমার মা কোথা বল, মাকে ত কেউ প্রাণে মারে নাই? আমার মাকে আর আমাকে রক্ষা কর, তুমি যা চাইবে, তাই দিব।" হরের মা, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন বালিকার কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার মহানন্দ উপস্থিত হইল। বালিকা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া, পশ্চাতের দিকে সরিয়া দাঁড়াইল।

বালিকা বিস্তর কাঁদিল, অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু হরের মায়ের নিকট হাস্য ভিন্ন অন্য কোন উত্তর পাইল না।

বালিকা ক্রোধে কহিল, "এখানে আমাকে কেন আনিলি?" হরের মা হাসিয়া বলিল, "অমাহাদের মারিতে।"

বালিকা ব্যাকুল-নেত্রে প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া কহিল, "হরের মা! আমায় একটু জল দে, পিপাসায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে।"

প্রৌঢ়া বোধ হয়, প্রভাতের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া থাকিবে, সে একটু হাসিয়া কহিল, "তা হ'লে, আর আমাকে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।"

বালিকা আর একবার প্রৌঢ়ার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। পরে একটি কাষ্ঠদণ্ড তুলিয়া লইয়া, কহিল, "আমার নিকটে আসিলেই তোর মৃত্যু নিশ্চিত।" বালিকা দ্বারের দিকে ছুটিল। হরের মাও ছুটিয়া, তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিল। প্রভাতকুমারী সাহস-সহকারে সজোরে তাহার হস্তে আঘাত

করিবা মাত্র, দুষ্টা তাহার বসন ত্যাগ করিল। বালিকা দ্বার খুলিয়া, প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। আঘাত পাইয়া, প্রৌঢ়া পদ-বিদলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, ক্ষোভে দুঃখে তাহার হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইল।

প্রভাতকুমারী বাটীর বাহিরে আসিয়াই প্রান্তরের দিকে ছুটিতে লাগিল। হরের মা কুপিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় তাহার পশ্চাৎ ছুটিল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া, বালিকা মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একবার একদিকে যায়, হরের মাও পশ্চাতের দিকে ছুটিতে থাকে; এই ধরে, এই ধরে, প্রভাতকুমারী প্রাণের দায়ে দৌড়ায়; আবার অন্যদিকে যায়, হরের মাও পিছনে ছোটে।

ধনীর দুহিতা, পিতামাতার আদরে পালিতা প্রভাতকুমারী এক দিনের জন্যও বাটি হইতে বাহির হয় নাই; যান ব্যতীত এক পাও কখন চলে নাই। তাহার পক্ষে এরূপ বন্ধুর প্রান্তরে দৌড়ান যে, কি কষ্টকর, ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এতক্ষণ যে ছুটিয়া ছিল, সে কেবল প্রাণের দায়ে, আর ছুটিতে পারে না; সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, বন জঙ্গল,—পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, কালের করাল কিঙ্করী হরের মা। প্রাণপণে বনপথে ছুটিতে ছুটিতে, সহসা পতনশব্দে ফিরিয়া দেখেন, হরের মা পড়িয়াছে। তবু কি বিশ্বাস আছে! অবসর পাইয়া, প্রভাত-কুমারী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল, বেশ পথ আছে, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল অন্তরে সেই পথেই চলিল।

বেলা আর অধিক নাই। অস্তোন্মুখ রবি-কিরণ গাছের পাতায় পাতায় চিক্ চিক্ করিতেছে। বনভূমি উত্তীর্ণ হইবার জন্য, প্রভাতকুমারী চলিতে অশক্ত হইলেও, দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

সহসা সম্মুখের জঙ্গলে বৃক্ষপত্রের মর্ মর্ শব্দে, চাহিয়া দেখে, যমাকৃতি দুইজন দীর্ঘকেশ, ভীষণমূর্ত্তি লোক লাঠি ও ছুরি হস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের আরক্ত-ঘূর্ণিত-নেত্র দেখিয়া প্রভাত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবীকুমার।

র্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা যে সময়ে সংঘটিত হয়, ঠিক সেই সময়েই এক অশ্বারোহী যুবক এই অনতি-বিস্তৃত বনভূমির অপর-পার্শ্বস্থ বিলাসপুরের পান্থশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আরও দুই জন লোক আসিয়াছে। তাহারা তাঁহার পার্শ্বের গৃহে স্থান পাইয়াছে।

নবাগত ব্যক্তি আসিয়াই, আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে কহিলেন ; কারণ, তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এই নবাগত যুবকের নাম দেবীকুমার মিত্র। তাঁহার নিবাস বঙ্গদেশের কোন একটী পল্লিতে। তিনি বঙ্গেশ্বরের একজন কর্ম্মচারী, কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে এ প্রদেশে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে, তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। কারণ রজনী-সমাগমে তৎকালে, সে প্রদেশে ভ্রমণ করা, তত বিপদশূন্য নয়। তাঁহার ভৃত্যাদি তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

সরাইয়ের অধিকারী তাঁহার পরিচয় পাইয়া, বিশেষ যত্নসহকারে, আহারাদির সংগ্রহ করিয়া দিল। আহার করিতে বসিয়া, পার্শ্বস্থ গৃহের ব্যক্তিদ্বয়ের কথোপকথন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন কাহারও গোপনীয় কথা শুনিবার চেষ্টা করেন নাই। দুইখানি ঘরের মধ্যে সামান্য বেড়ার আবরণ মাত্র। সুতরাং পার্শ্বের গৃহে কথা কহিলে, অপর গৃহ হইতে অনায়াসে শোনা যায়। দেবী-কুমার দুই তিনবার কাসিবার ভাণ করিয়া, পার্শ্বের ঘরে যে, লোক আছে, জানাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা এতদূর নিবিষ্টমনে আপন কর্ম্মে ব্যস্ত যে, তাঁহার সঙ্কেত বুঝিয়াও বুঝিল না।

তাহারা অতি ধীরে কথাবার্ত্তা কহিলেও, তিনি যে দুই চারিটী কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহাদের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, একজন ভদ্রবংশীয় ও একজন নীচকুলোদ্ভব। চারিটী অসম্পূর্ণ বাক্য তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন ;—গোলাবাড়ীর উপরকার ঘরে ;-নৌকা ডুবি করিয়া মারিতে ;-লাস পুঁতিতে ; প্রভাতকুমারী—আর শুনিতে পাইলেন না। কারণ, মন্ত্রণা-কারীরা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিল। যদিও এই চারিটী কথার দ্বারা তাহাদের সমুদায় পরামর্শের সারসংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তথাপি এইমাত্র বুঝিলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা কাহাকে, সম্ভবতঃ, প্রভাতকুমারীনাম্নী কোন রমণীকে হত্যা করিয়া, তাহার মৃত শরীর মাটির মধ্যে পুঁতিবে, এবং নৌকা ডুবি হইয়া মরিয়াছে, প্রচার করিবে।

পার্শ্বের গৃহের লোক দুইজন কি প্রকার ভীষণ প্রকৃতির, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, দেবীকুমার বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল; বেড়ার ছিদ্র দিয়া, পার্শ্বের গৃহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন পূর্ব্বে তাহাদিগকে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন।

দেবীকুমার পান্থশালার কর্ত্তাকে বাহিরে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পার্শ্বের গৃহের লোক দুই জনকে চেন?"

সে ব্যক্তি কহিল, "আজ্ঞা, চিনি বই কি! অবনীকুমার বাবু আমাদের জমিদার—বিক্রমপুরে উহাদের বাড়ী। এ গ্রামেও বাবুদের জমিদারী আছে। বাবু যখন এদিকে কোথাও যান, অনুগ্রহ করিয়া, আমার এখানে পদধূলি দেন।"

দেবীকুমার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাহাকে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া, অশ্বারোহণে বনগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাঠক! এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, পার্শ্বের গৃহের লোক দুইজন কে? একজন অবনীকুমার, অপর তাঁহার অনুচর চণ্ডে চাঁড়াল। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, তাহাও আর বুঝিতে বোধ হয়, পাঠকের বাকি নাই।

বিলাসপুরগ্রাম ও তৎসন্নিহিত কয়েকখানি গ্রাম বিক্রমপুরের জমিদারীর অন্তর্গত। বিলাসপুরের নিকটেই একটী অনতিবিস্তৃত বন, তাহার পার্শ্বে বহুবিস্তৃত ধান্য-ক্ষেত্র, ও প্রান্তর-মধ্যস্থ অট্টালিকাও উক্ত জমিদারবংশের বিষয়। মৃত নবকুমার দত্ত কৃষিকার্য্য বড় পছন্দ করিতেন, তিনি এই

জন্য বনজঙ্গল কাটাইয়া, শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং প্রান্তরের মধ্যে এক বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া, চাষের সুবিধা করেন। চাষের সময়ে লোকজন আসিয়া, ঐখানে বাস করিত, শস্যাদি উৎপন্ন হইলে, সে সকলের সুবন্দোবস্ত করিয়া, তাহারা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিত।

নীহারকুমারীর প্রণয়লাভে বিফল-প্রয়াস হইয়া, নর-পিশাচ অবনীকুমার উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক, তাঁহাকে করগত করিতে চেষ্টা করিলেন। মন্ত্রী হইল—চণ্ডে চাঁড়াল। আমাদের প্রৌঢ়া হরের মা চণ্ডের পিসী। পাপিনীর জীবনে অনেক পাপকর্ম্মের সংঘটন হইয়াছে। প্রথম বয়সে অবনীকুমার এক নীচবংশীয়া রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন, প্রৌঢ়াও তাহার ভিতরে ছিল। সেই, সকল বিষয়ের সংঘটন করিয়া দেয়। চণ্ডে ও অবনীকুমার পরামর্শ করিয়া, তাহাকে যে প্রকার পত্রের সহিত নীহারকুমারীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল, যে প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া, কুলকামিনীকে গৃহত্যাগিনী করিতে লইয়া আসিয়াছে, পাঠক! তাহার সমস্ত অবগত হইয়াছেন।

যে নৌকায় নীহারকুমারী ও প্রভাতকুমারী যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল দাঁড়ি মাঝি ছিল, তাহারাও এ ষড়যন্ত্রের, সকল বিষয়, না হউক, বাহিরের কতক অংশ অবগত ছিল। তাহাদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, যে প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। প্রভাতে তাঁহাদের নৌকা খুলিয়া দিলে, কোন কার্য্যের ভাণ করিয়া, তিনিও অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন,

কিয়ৎক্ষণের পর চণ্ডেও প্রভুর অনুসরণ করিল। বিমলা ছাদে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিল। বিমলা, এখন আর সে বিমলা নাই; সরলা, সুহাসিনী বিমলা, এখন কুটিলা, গম্ভীর-স্বভাবা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা। বিমলা এখন বুঝিয়াছে, তাহার প্রতি অবনীর ভালবাসা কিছুমাত্র নাই; সে তাহার স্বার্থসিদ্ধির অবলম্বন, অথবা রূপ-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার উপকরণ মাত্র।

দেওয়ানজীর মৃত্যুর পর হইতেই, তাহার মনের ভাব এক রকম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সরল বিশ্বাসের পরিণাম অতি শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। নরহত্যার ভীষণ অনুতাপ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। গভীর নিশীথে, তাহার নিদ্রাহীন-নয়নে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হয়; প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার হৃৎপঞ্জর এক একখানি করিয়া খসিয়া পড়ে। তাহার উপর অবনীকুমারের তাচ্ছিল্য-ভাব তাহার প্রাণনাশকর হইয়াছিল। অবনী এখন তাহার প্রতি ফিরিয়াও চায় না,—অযাচিতা হইয়া নিকটে আসিলে, কথাও কয় না; এ অপমান কি বিমলার প্রাণে সয়? বিমলা বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রণয় লাভে অসমর্থা হইয়া, মনে মনে ভাবিল,—"বোধ হয়, হতভাগ্য অপর কাহার প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছে, তাই আমাকে আর মনে ধরে না। প্রাণ থাকিতে, আমি আর কাহাকেও তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে দিব না। বরং দুই জনে এক সঙ্গে মরিব, তথাপি আর কাহাকেও দিব না।" বিমলার মনের ভাব এখন এই প্রকার। বিমলা অন্তরালে থাকিয়া, তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন আবাসে।

ভীমাকার কৃষ্ণবর্ণ দুইজন নরহন্তার ভীষণাকৃতি অবলোকন করিয়া, প্রভাতকুমারীর অঙ্গ-যষ্টি বাত্যা-বিতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় থর থর কাঁপিতে লাগিল। সহসা, কে যেন, তাঁহার চরণে শত মণ ভার বাঁধিয়া দিল। তিনি পদমাত্র পলাইতে পারিলেন না। হরের মায়ের কবল হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এবার রক্ষা পাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা ভাবিয়া, বালিকা যুক্তকরে কাতরস্বরে কহিল,— "ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় প্রাণে মের না। আমার নিকট যা আছে, সবই দিতেছি, আমায় প্রাণে মের না!"

দস্যুদের মধ্যে একজন কহিল, "তোর কাছে যা যা আছে, যদি সবই দিস্, তোকে ছেড়ে দিব।"

বালিকা কম্পিতহস্তে গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। অর্থ-লোলুপ দস্যুর আর বিলম্ব সহিল না; নিজ হস্তে তাহার গহনাদি খুলিবার জন্য তাহার হাত টানিয়া ধরিল। ভয়ে বালিকার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মাথা

ঘুরিতে লাগিল। কাতরা, মর্ম্মাহতা বালিকা ভীতা হইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। অপর ব্যক্তি ছুরি তুলিয়া, বিকটস্বরে বলিল, "চীৎকার করিলেই, কাটিয়া ফেলিব।" বালিকা নীরব হইল;—আকাশ, বৃক্ষ, লতা, সব যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে, মাটিতে বসিয়া পড়িল—শরীর অবসন্ন হইয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। দস্যু দুইজন আপন কাজেই ব্যস্ত; অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া, কাপড়ে বাঁধিল,—প্রভাতকুমারীর পরিধেয় বসনখানি খুলিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। তাহারা লুণ্ঠন ব্যাপারে এতদূর নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রভাতকুমারীর অলৌকিক রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দিকে আকুলনেত্রে চাহিয়া ছিল যে, অশ্বের পদশব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সহসা চমক ভাঙ্গিল, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, একজন অশ্বারোহী যুবক তাহাদের শতহস্ত পশ্চাতে আসিতেছে; দস্যুদ্বয় তাহাকে একা আসিতে দেখিয়া, প্রভাতকুমারীকে ত্যাগ করিয়া, নবাগতকে আক্রমণ করিবার জন্য লাঠি ধরিল। যুবক বস্ত্রের মধ্য হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া, এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলেন। সে পদে আহত হইয়া পড়িল; দ্বিতীয় অবসর পাইয়া, পলাইয়া জীবন রক্ষা করিল। আহত ব্যক্তি ভগ্নপদ হইয়া, লাঠির সাহায্যে পার্শ্বস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

অশ্বারোহী আর কেহই নন; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দেবীকুমার। তিনি বিলাসপুর হইতে বনগ্রামে যাইতেছেন। প্রভাতকুমারী একবার চীৎকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সে কাতর-প্রার্থনা দেবীকুমারের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। দেবীকুমার

দূর হইতে নারী-কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া, অশ্ব দ্রুত ধাবিত করেন। পরে যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন।

তিনি ইচ্ছা করিলে যে, দস্যুকে প্রাণে মারিতে পারিতেন না, এমন নহে। তাহাকে প্রাণে মারা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখাই তাহার অভিপ্রায়, তাই তাহার পদে গুলি করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দস্যু দুইজন পলায়নপর হইলে, দেবীকুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, বালিকার নিকট যাইলেন; ইহার পূর্ব্বে, এ প্রকার রূপের সমাবেশ আর কখন একত্রে দেখেন নাই। প্রথম দর্শনে তাঁহার বোধ হইল, যেন পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর নীলাম্বর ভ্রষ্ট হইয়া,অরণ্যে পড়িয়াছেন। তিনি শশব্যস্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া, উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, দস্যুরা তাঁহাকে কোন আঘাত করে নাই, সম্ভবতঃ ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছেন। বালিকার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অনেক চেষ্টায়ও জল পাইলেন না; তখন অনন্যোপায় দেবীকুমার তাঁহাকে তুলিয়া, প্রথমতঃ অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন, পরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিজে আরোহণ করিলেন। একবার ভাবিলেন, দিনাজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বালিকার জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু দেখিলেন, দিনাজপুর হইতে অনেক দূরে আসিয়াছেন— তাঁহার গন্তব্য বনগ্রামও প্রায় ততদূর। তখন বনগ্রামে যাওয়াই মনস্থ করিলেন। হীনচেতনা কুসুম-কোমলা বালিকার জড়বৎ দেহযষ্টিকা বক্ষের উপর ধারণ করিয়া, বাম হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে অশ্বরশ্মি ধরিয়া নক্ষত্রবেগে অশ্ব চালিত করিলেন।

এরূপ অবস্থায় না পড়িলে, ওরূপ উদিত-যৌবনা ললনাকে বক্ষে লইয়া যাইতে, তিনি কোন প্রকারেই স্বীকৃত হইতেন না; তাঁহার ন্যায় বিমল-চরিত্র, সৎসাহসী যুবক দুর্লভ। এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; কখনও কোন কামিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতে, অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কিন্তু মানুষের মন যতই দৃঢ় হউক না কেন, পঞ্চশরের শরাঘাতে চঞ্চল হইবেই হইবে। কিশোরীর শিথিল-বসন, ঈষদুন্নত বক্ষঃস্থল, অশ্বের দ্রুতগমন সময়ে, পুনঃ পুনঃ যত তাঁহার বক্ষে আসিয়া অভিহত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বিশাল বক্ষঃ বাত্যাভিতাড়িত বারিধির ন্যায় চঞ্চল হইতে লাগিল,—ততই তাঁহার হৃদয়ের নিগূঢ় কন্দরে, এত দিনের প্রসুপ্ত কোন একটী বৃত্তি যেন জাগিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক কষ্টে সুন্দরীর সুন্দর গণ্ডে একটী চুম্বনের প্রয়াস দমন করিলেন।

ক্রমশঃ বেলার অবসান হইয়া আসিল। দেবীকুমারও অপরিচিতা বালিকাকে লইয়া বনগ্রামে প্রবেশ করিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে আরও কয়েকবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমস্তই চেনা শুনা ছিল।

তিনি হলধর বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হলধর বাবু তাঁহার পরিচিত,—তিনিও এক সময়ে বঙ্গদেশে ছিলেন; সেই সূত্রে তাঁহার সহিত দেবীকুমারেরপিতার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সুতরাং রাজকার্য্যে তিনি এ প্রদেশে আসিলেই, তাঁহার আবাসে থাকিয়া, কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। হলধর বাবু নিঃসন্তান, বৃদ্ধ। তাঁহার সংসারে, তাঁহার

পরিবার ও একটী বিধবা ভাগিনেয়ী। তিনি দেবীকুমারকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ মূর্চ্ছিতার প্রতি তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হয় নাই, সহসা দৃষ্টি পড়াতে সাশ্চর্য্যে কহিলেন,—"বাবাজী! এ কি?"

দেবীকুমার সংক্ষেপে সকল বিবরণ বলিয়া, বালিকার মূর্চ্ছার অপনোদনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। হলধর বাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি শয্যা রচনা করিয়া দিলেন এবং জল আনিয়া বালিকার চোকে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। দেবীকুমার হলধর বাবুকে একজন চিকিৎসক আনিতে পাঠাইলেন।

শীঘ্রই একজন কবিরাজ আসিয়া, বালিকার অবস্থা দেখিয়া কহিলেন,—"ভয় নাই, এখনি সংজ্ঞা হইবে।" এই বলিয়া, কি একটী উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইয়া দিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে বালিকার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। এখন ঔষধের গুণে ও দেবীকুমারের শুশ্রূষায় প্রভাতকুমারীর চৈতন্য সম্পাদন হইল। ধীরে ধীরে নয়ন-পদ্ম বিকসিত হইল—বালিকা চাহিয়া দেখিল।

কবিরাজ কহিলেন,—"একটু দুধ গরম করিয়া, খাইতে দিন, রোগী বল পাইবে।" কবিরাজ. পারিশ্রমিক পাইয়া, বিদায় হইলেন।

প্রভাতকুমারীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে, চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে তালবৃন্ত হস্তে একটী সুন্দর যুবক প্রাণপণ-যত্নে তাঁহার সেবা করিতেছে। আর কয়েকজন লোক আশে পাশে দাঁড়াইয়া, বা বসিয়া আছে। তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার সেই যুবকের দিকে চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, যুবকও তাঁহার মুখের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন। অমনি বালিকা

লজ্জা-নম্রমুখী হইয়া, মাথায় বস্ত্রপ্রান্ত টানিয়া দিতে, কর-পল্লব প্রসারিত করিল।

দেবীকুমার কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বোধ হয়, দস্যুরা তোমায় আঘাত করে নাই?"

বালিকা শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং যুবকের দিকে আর একবার সরলদৃষ্টিপাত করিয়া, গলদশ্রুলোচনে কহিল, "আমাকে তাহারা প্রহার করে নাই, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। আমার মা'কে বোধ হয়, তাহারা এতক্ষণ হত্যা করিয়া থাকিবে।"

দেবীকুমার শশব্যস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মা'কে হত্যা করিয়াছে; তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"বাড়ী বিক্রমপুর; আমি এবং আমার মা বিষগ্রামে আমার মাতামহীকে দেখিতে যাইতেছিলাম। আমার বোধ হয়, আমাদের কোন গুপ্ত শত্রু আছে।"

যুবক কহিল,—"তোমার পিতার নাম কি?"

বালিকা কহিল—"আমার পিতা নাই—কাকা আছেন, তাঁর নাম অবনীকুমার দত্ত।"

দেবীকুমার শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে যেন, তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল—"অবনীকুমার দত্ত!"

প্রভাত-কুমারী যুবকের সেই প্রকার ভাব দেখিয়া, ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মহাশয়! ওরূপ কহিলেন, আপনি কি তাঁহাকে চেনেন?"

দেবীকুমার সরল ভাবে কিয়ৎক্ষণ প্রভাতের মুখের

দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন,—"তোমার নাম কি প্রভাত-কুমারী ?"

বালিকা লজ্জায় মুখ নত করিয়া কহিল,—"হাঁ।" তাঁহার গণ্ডস্থল লোহিতাভায় রঞ্জিত হইল।

এখন দেবীকুমার বিলাসপুরের পন্থাশালায় অবনীকুমার ও তাঁহার ভৃত্যের কথোপকথনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তিনি প্রভাতকুমারীকে একে একে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাতকুমারী হরের মায়ের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে তিনি, তাঁহার মাকে নৌকায় রাখিয়া, হরের মা'র সহিত নদীতীরস্থ গোলাবাড়ী দেখিতে উপরে উঠেন, পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নদীতে নৌকা দেখিতে পান নাই, তাহার পর হরের মায়ের প্রবঞ্চনায় কি প্রকারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাহার কার্য্যাবলী দেখিয়া, তাহার উপর সন্দিগ্ধ হইয়া, কেমন করিয়া, পলায়ন করেন ও পরে কি প্রকারে দস্যুহস্তে পড়েন, একে একে সকলই বলিলেন।

এ সমস্ত যে অবনীকুমারের কার্য্য, তাহা আর তাঁহার বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। বালিকা দেবীকুমারের পদযুগল ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"মহাশয়। দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, কোনরূপে আমার দুঃখিনী জননীর জীবন রক্ষা করুন। পাষণ্ডেরা হয় ত এতক্ষণ, আমার মা'র প্রতি কত অত্যাচার করিতেছে। তাঁহাকে হয় ত, প্রাণে মারিতেছে।"

দেবীকুমার বালিকার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া,

কহিলেন,—"আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে, তোমার কাকাই এই সকল অনর্থের মূল। তোমার মাতাকে প্রাণে মারিবে না, সম্ভবতঃ তাঁহার কোন অসদভিপ্রায় থাকিবে। তোমার মা'র জন্য কোন ভাবনা নাই, আমি যেরূপে পারি, তাঁহার উদ্ধার করিব। যত দিন তোমার মা'র সন্ধান না পাই, তুমি এইখানে থাক।"

বালিকা অগত্যা স্বীকার করিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য নয়নাশ্রুপাতের বিরাম ঘটিল না।
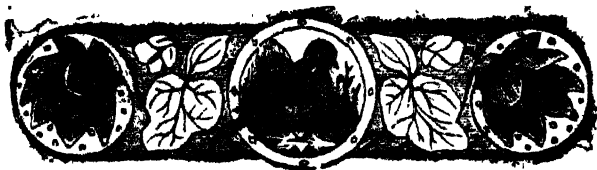
দশম পরিচ্ছেদ।

অবরোধে।

রের মা প্রভাতকুমারীকে লইয়া, প্রান্তরে উঠিবা মাত্র নৌকাচালক নৌকা খুলিয়া দিল। নীহার কুমারী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ কি! নৌকা খুলিয়া দিলে কেন?"

মাঝি উত্তর করিল, "নৌকা ফিরাইয়া রাখিতেছি।" নীহারকুমারীর বিশ্বাস হইল না, কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "কোথায় লইয়া যাইতেছ,—নৌকা থামাও?" তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেগে দাঁড় বাহিয়া চলিতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর অথচ কম্পিতস্বরে আদেশ করিলেন,—"নৌকা থামাও, আমি স্ত্রীলোক, নৌকায় একা রহিয়াছি—তোমরা নৌকা লইয়া, কোথায় যাইতেছ?"

মাঝি কোন উত্তর করিল না, কেবল একটু হাসিল। প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই নীহার-কুমারীর মনে অকস্মাৎ একটী সন্দেহ-ভাবের আবির্ভাব হইল। বোধ হইল, যেন ইহার ভিতর কোন প্রকার ষড়যন্ত্র আছে। তিনি বিপদ বুঝিতে পারিয়া, কুপিতস্বরে কহিলেন,—"যদি ভাল চাও, আমার কথা শোন।"

ইতিমধ্যে নৌকা আসিয়া, নদীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী শাখার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মাঝি তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল,—"আমাদের কোন অপরাধ লইবেন না, আমরা ভৃত্য মাত্র, যেমন আদিষ্ট হইয়াছি, কার্য্য করিব। আপনি এখন বন্দী, আপনার জীবনের উপর কোন অত্যাচার করা হইবে না।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সকল বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং কাহার দ্বারা এ সকল কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। এখানে কাহারও সাহায্য পাইবার আশা নাই ভাবিয়া, তিনি আরও কিছু বিচলিত হইলেন; কারণ তখন নদী দিয়া, নৌকা বড় একটা যাতায়াত করিত না। দুইটী ভাবনায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। প্রথম চিন্তা,—প্রভাতকুমারীর কারণ, হরের মা তাহাকে লইয়া কোথায় গেল, তাহার প্রাণের ত কোন হানি করিবে না? দ্বিতীয় ভাবনা,—তাঁহার নিজের। তিনি এখন একজন নীচ-প্রকৃতি পাষণ্ডের হস্তে পড়িয়াছেন। বাটীতে থাকিতে, তাঁহার পাপ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এখন সে তাঁহাকে সম্পূর্ণ করগত করিবার অভিপ্রায়ে এই ছলনা-জাল বিস্তার

করিয়াছে। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবন যায়, সেও স্বীকার, তবু নিজের সতীত্ব রক্ষা করিবেন।

প্রভাতকুমারীর আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া, তাঁহার বড়ই আশঙ্কা হইতে লাগিল। কামরার বাহিরে আসিয়া, বারবার কন্যার জন্য দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে স্থানের নদীর উভয় তট এত উচ্চ যে, উপরের কোন দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না। বারংবার তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, মাঝিদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহারা আরক্তনয়নে কহিল, "যদি তিনি ঘরের ভিতর গিয়া না বসেন, তাহা হইলে তাহারা জোর করিয়া তাঁহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া দিবে এবং তাঁহার মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া, ফেলিয়া রাখিবে।" নীহারকুমারী বুদ্ধিমতী, বুঝিলেন, দুর্বৃত্তেরা মুখে যাহা বলিতেছে, কার্য্যে পরিণত করা তাহাদের পক্ষে বড় অসাধ্য নয়। আরও তিনি ভাবিলেন, তিনি এখন বিক্রমপুরের জমিদার-গৃহিণী নহেন, একজন সামান্যা রমণীমাত্র। তিনি ধীরে ধীরে কামরার মধ্যে যাইয়া, নয়নজলে হৃদয়ের উদ্দীপ্ত ক্রোধানলের শান্তি করিতে লাগিলেন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, হরের মা প্রভাতকুমারীকে গোলাবাড়ীর মধ্যে পুরিয়া, একবার দ্বিতলের ছাদের উপর উঠিয়াছিল। প্রভাতকুমারী তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে, তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল। হরের মা উপরের ছাদে উঠিয়া দেখিল, নৌকা-চালকেরা পূর্ব্ব ইঙ্গিত মত নৌকা লইয়া শাখার মধ্যে রক্ষা করিতেছে। সে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে কহিল, "পক্ষী জালে আবদ্ধ হইয়াছে।"

এদিকে অবনীকুমার ও চণ্ডেচাঁড়াল বিলাসপুর হইতে গোলাবাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দূর হইতে দেখিলেন, ভগ্নপদা কে এক বৃদ্ধা অতিকষ্টে তাঁহাদের নিকট আসিতেছে। অবনীকুমার অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, হরের মা। তিনি ব্যাকুলভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে প্রকার ঘটিয়াছে, হরের মা সমস্তই কহিল; তিনি শুনিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "যা'ক, এখন নীহারকুমারী কোথা?"

হরের মা কহিল, "নৌকায় আছে, তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই। কিন্তু যদি প্রভাতকুমারী পলাইয়া যায়, সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।"

অবনীকুমার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কোন ভয় নাই, সে ইতিপূর্ব্বে তোমায় আর কখন দেখে নাই এবং ইহার পর, যাহাতে আর কখন দেখিতে না পায়, তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইবে। তাহাকে বন্যজন্তু অথবা দস্যুতে মারিয়া ফেলাই সম্ভব, যদি কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া বিক্রমপুরে যায়, আমাদিগকে কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার গল্প শুনিয়া, এই গোলাবাড়ীর প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইতে পারে এবং কেহ কেহ এখানে সন্ধানও লইতে পারে।" পরে চণ্ডের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "নৌকা শীঘ্র ঘাটে ভিড়াইতে বল। সন্ধ্যা হয় হয়, এখানে আর আমাদের থাকা হইবে না, রাত্রের মধ্যেই বিক্রমপুরে যাইতে হইবে।"

চণ্ডে জিজ্ঞাসা করিল, "বিক্রমপুরে কোথায় রাখিবেন?"

অবনী হাসিয়া কহিলেন, "কেন, উদ্যানবাটীর যে অংশে

লোকের যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেইখানে। আমি হইয়া অবধি, সে কুঠরীগুলি কখন খুলিতে দেখি নাই। তবে সাবধানে নৌকা হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

পরামর্শ ঠিক হইলে, চণ্ডে যাইয়া নৌকা লইয়া আসিল। অবনীকুমার মাঝিকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন; এবং চণ্ডেকে কহিলেন, "হরের মাকে যাইবার সময় নাটোর গ্রামে তুলিয়া দিয়া যাইবে।"

তখন ধরাধরি করিয়া, হরের মাকে নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। কারণ, পড়িয়া যাওয়াতে সে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, নিজে নৌকায় উঠিবার সামর্থ্য নাই। পরে চণ্ডে চাঁড়াল নৌকায় গিয়া বসিলে, অবনীকুমার একবার উঠিয়া নীহার-কুমারীর নিকটে যাইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি প্রথমতঃ নানা প্রকার ভৎর্সনা করিলেন, শেষে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত, আমি দিনেকের তরেও তোমায় অন্য চক্ষে দেখি নাই। তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিও না, আমি অসহায় রমণী, আমার ধর্ম্মে হাত দিলে, ভগবান কখন তোমার ভাল করিবেন না। আমায় বিক্রমপুরে রাখিয়া আইস, আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব।"

অবনী কহিলেন, "বউ! যে পথে আসিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। তুমি এখন আমার জীবনের জীবনীশক্তি, তোমাকে নিমেষের তরে চক্ষের অন্তরাল করিলে, আমি বাঁচিব না। আমার শরীরের শোণিতে, অস্থিমজ্জার ভিতরে এখন তুমি; তোমাকে পাইবার জন্য বহু পাপ করিয়াছি,

এখনও করিতে প্রস্তুত আছি। যখন তোমাকে গৃহ হইতে এতদূর আনিয়াছি, তখন তোমাকে আমার অঙ্কশোভিনী করিবই করিব। যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে, তোমাকে আবার বিক্রমপুরে লইয়া যাইব, আবার তুমি স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে, আবার তুমি প্রভাতকুমারীকে পাইবে ; নচেৎ এ জীবনে এই পর্য্যন্ত।"

অবনীর কথা শুনিয়া, নীহারকুমারী কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, লজ্জায় ও ঘৃণায় মৃতবৎ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। মুখ চক্ষু এবং কর্ণ দিয়া যেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অভিমানে নয়নে জল আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, অবনীর মুখের পানে কাতর নয়নে চাহিয়া কহিলেন, "অবনি! এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমি একে অসহায়া স্ত্রীলোক, তাহাতে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া, আমার উপর কেন এ সকল অত্যাচার? এতদিন যে, তোমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিয়া আসিলাম, এই কি তাহার পরিণাম! তোমার জ্যেষ্ঠের স্মৃতি কি তোমার হৃদয় হইতে এককালে লুপ্ত হইয়াছে? তিনি যে, তোমাকে কত ভালবাসিতেন, কত স্নেহ করিতেন, সুখে দুঃখে তোমার সহায় ছিলেন, পিতার আদেশ অমান্য করিয়া, তোমার সাহায্যের জন্য প্রাণপণ করিতেন, তুমি কি তাঁহার সেই ভালবাসার, সেই স্নেহের, সেই স্বার্থশূন্যতার এইরূপে পরিশোধ দিবে? তোমার সুখের সহায়, দুঃখের অবলম্বন, স্নেহময় ভ্রাতার সহধর্ম্মিনীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কি তোমার সাজে? আমার বিক্রমপুরে

রাখিয়া আইন, এ সকল বিষয় ভুলিয়া যাও। আমি একে স্বামী-শোকে অধীরা, তাহার উপর আর যন্ত্রণা দিও না। তোমার হাতে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর।" এই বলিয়া অবনীর হস্ত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া পাষাণ-প্রাণ অবনীরও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর হস্ত হইতে, আপন হস্ত ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া কহিলেন, "বউ! তোমার কথা শুনিতাম, যদি তোমার রূপের আবর্ত্তে না পড়িতাম। তোমার রূপের উপাসক হইয়া মরিয়াছি; ঐ সুন্দর, ফুটন্ত গোলাপের মত মুখখানি, আবেশময়ী ঐ আঁখি দুটী, কাল কাদম্বিনীর ন্যায় ঐ স্তরে স্তরে ঢেউখেলান চুলগুলি যখন দেখি, আত্মহারা হই, হৃদয়ের মধ্যে কি যেন, কি তড়িতের প্রবাহ ছুটে; তুমি কথা কও, যেন বীণার ঝঙ্কার হয়; মন্ত্রমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হয়ে শুনি। প্রথমে যদি জানিতাম, যাহাকে ভালবাসিব, তাহাকে পাইব না, তাহা হইলে কি স্বেচ্ছায়, যত্ন করিয়া হৃদয়ে ও মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতাম! বউ! তুমি জান না, তোমায় কত ভাল বাসি, দেখিলে আমার হৃদয়ের মাঝে কি ভয়ঙ্কর প্রলয়ের ঘোর আবর্ত্ত উপস্থিত হয়! যাহা হইবার হইয়াছে, চল, দুইজনে আবার সংসার পাতিগে। নূতন সংসারে, নূতন প্রেমে, নূতন আমোদে দিন কাটিবে।"

অবনীর হৃদয়ের রুদ্ধ পথ এখন মুক্ত হইয়াছে। অন্তরের যেখানে যাহা ছিল, সকলই প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। নীহারকুমারী কি সকল কথা শুনিলেন? না, তিনি মর্ম্ম

পীড়িতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে কহিলেন, "অবনী! এ জগতে তোমার আশা মিটিবে না! এখনও তোমায় ভাল কথায় বলিতেছি, আমার কথা শোন, আমায় ত্যাগ কর, নহে সতীর অভিশাপে, পতি-পরায়ণার মনস্তাপে, তোমায় অনন্ত-নরকে বাস করিতে হইবে।"

অবনী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না; হাসিয়া কহিলেন, "তোমায় পাইলে, সহস্র জীবনেও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হও, নচেৎ তোমার অদৃষ্টেও অনেক কষ্ট আছে।"

অবনীকুমার ভাবিয়াছিলেন, নীহারকুমারী আশঙ্কা প্রযুক্ত অবশ্যই স্বীকৃত হইবে, কিন্তু ফল বিপরীত হইল। তিনি দৃঢ়তা-ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন,—"নরকের কীট আমার সম্মুখ হইতে দূর হ'! মানুষের কল্পনায় যতদূর কষ্ট দেওয়া সম্ভব হয়, দিস্, প্রফুল্লবদনে সহিব, তথাপি তোর ও ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব না।"

অবনীকুমার কহিলেন,—"তবে মর, দুদিন পরে রক্তের তেজ কমিলে আপনাকেই স্বীকার করিতে হইবে।" পরে চণ্ডকে কহিলেন,—"আমি চলিলাম, তুই নৌকা লইয়া আয়, যদি চীৎকার করে, মুখ বাঁধিয়া রাখিতে কুণ্ঠিত হ'স্ না।"

নীহারকুমারী ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কেবল কাঁদিলেন। অবনীকুমার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিক্রমপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া আবশ্যকীয় সকল কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিয়া রাখিলেন।

এদিকে নৌকা খুলিয়া দিল, অর্থ লোভে দাঁড়িরা জোরে জোরে দাঁড় বাহিতে লাগিল। পথিমধ্যে হরেরমাকে নাটোরে নামাইয়া দেওয়া হইল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নৌকা যাইয়া বিক্রমপুরের ঘাটে লাগিল। সকলেই সুষুপ্ত। অট্টালিকা-শ্রেণী নীরব, নিস্পন্দভাবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

ঘাটে নৌকা লাগাইবা মাত্র চণ্ড নীহারকুমারীর কামরায় গিয়া দেখিল, তিনি বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। কোন কথা না বলিয়াই, সে বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। পরে ধীরে ধীর উপরে উঠিয়া, বাগানের দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, দ্বার উন্মুক্ত।

দ্বারের নিকট দাঁড়াইবা মাত্র অবনীকুকার তাহার নিকটে আসিয়া ধীরে কহিলেন, "সাবধানে লইয়া আয়, যেন চীৎকার না করে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া, চণ্ড চলিয়া গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে নীহারকুমারীকে কাঁধে লইয়া, উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। উপবনে বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া, সতর্কে পা ফেলিয়া, উদ্যানস্থ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। অবনীকুমার তাহার হাত ধরিয়া অতি ধীরে, অতি সাবধানে অবরোহিণী দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। দ্বিতলে আসিয়া পার্শ্বের একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গৃহে আলোক জ্বালা হইয়াছিল;—চণ্ড গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নীহারকুমারীকে নামাইয়া, তাঁহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। অমনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল।

নীহারকুমারী চাহিয়া দেখিলেন, গৃহে গবাক্ষাদি নাই। যাহা একটী ছিল, তাহারও খুলিবার উপায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহের দুইটী দ্বার; দালান দিয়া বাহির হইবার একটি, অপরটী দিয়া পার্শ্বের গৃহে যাওয়া যায়।

অবনীকুমার হাসি হাসি মুখে কহিলেন,—"এই তোমার কক্ষ। যতদিন না আমার কথায় সম্মত হও, ততদিন এইখানে থাকিতে হইবে। পার্শ্বের গৃহে একজন লোক সর্ব্বদাই থাকিবে, চীৎকার করিলে বা বাহির হইয়া, কাহাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলে, সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া, তোমাকে যেরূপে পারে থামাইবে। এমন কি, একেবারে নীরব করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

এই বলিয়া, তিনি বিদায় হইলেন। নীহারকুমারী পার্শ্বস্থ শয্যায় বসিয়া আপনার বিপন্ন অবস্থা ও কন্যার অভাবনীয় দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন।

অবনীকুমার চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, চণ্ডে চাঁড়াল পার্শ্বের ঘরে রক্ষক স্বরূপ রহিল।

অবনীকুমার যখন উদ্যান হইতে বাহির হইয়া যান, তখন একবার তাঁহার নয়নদৃষ্টি অন্ধকারে দেওয়ানজীর বাটির ছাদের উপর পড়িল। তাঁহার মনে হইল, কে যেন ছাদে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। মনে সন্দেহ হওয়াতে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার ভ্রম বিবেচনা করিয়া, শয়ন করিতে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে দেবীকুমার কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া, প্রভাতকুমারী-কথিত গোলাবাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার মুক্ত। বলা বাহুল্য, হরের মা চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহারও সাক্ষাৎ, বা মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন না পাওয়াতে, ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিমলার পরিণাম

দেওয়ানজির মৃত্যুর পর, বিক্রমপুরের বাটীতে বিমলাকে রাখিয়া, সকলে বৈকুণ্ঠপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া বিষয়াদির বন্দোবস্ত করিয়া যান।

বিমলা বাটীতে একা থাকে। দ্বিতলের কক্ষে জানালার ধারে বসিয়া, উদ্যানের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করে। কদাচিৎ একবার অবনীকুমারকে দেখিতে পায়। তিনি তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। বিমলা কত কাঁদে, কত অনুনয় করে, তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে, কিন্তু হৃদয়হীন অবনীকুমার, তাহার দিকে একবারও কটাক্ষপাত করেন না। বিমলা বুঝিতে পারিয়াছিল, অবনীর হৃদয়ে তাহার তিলমাত্র স্থান নাই, তথাপি মন বোঝে না বলিয়াই, এত চেষ্টা করে। শেষে যখন

কোনরূপে তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান পাইল না, তখন তাহার অন্তরে বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইল। বিমলা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

এক বিষ-প্রয়োগের কথা প্রকাশ করিলেই, বিমলা তাঁহাকে বিশেষ বিপন্ন করিতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, সেও, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আছে, কাজেই তৎসম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছে না। অবনীকুমারও জানিতেন, বিমলা বিষ প্রয়োগের কথা কাহাকেও বলিতে পারিবে না, সেইজন্য তাঁহার ভয়ের বিশেষ কোন কারণ ছিল না।

বিমলা তাঁহার অন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার সকল কার্য্যের উপর বিমলার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিল। পূর্ব্বে ইচ্ছা করিলে, পুষ্পোদ্যানে আসিতে পারিত, কিন্তু অবনী-কুমার সে পথও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে স্পষ্ট কহিয়াছেন, যেন সে, উদ্যানে আর না আইসে।

বিমলা গোপনে থাকিয়া দেখিত, অবনীকুমার ও চণ্ডে সর্ব্বদাই পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কি পরামর্শ করে। যদিও দূর হইতে সে তাহাদের একটীও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইত না তথাপি তাহাদের মুখভঙ্গি এবং হস্তাদি সঞ্চালন দেখিয়া বুঝিয়াছিল, আবার কাহার সর্ব্বনাশের পরামর্শ হইতেছে।

প্রাতঃকালে ছাদে উঠিয়া বিমলা দেখিল, বিক্রমপুর জমিদার-বাটীর গৃহ-লক্ষ্মী নীহারকুমারী কন্যার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠিতেছেন; পশ্চাতে এক প্রৌঢ়া; সে উঠিবার সময় তীরস্থ চণ্ডের দিকে এক প্রকার দৃষ্টিপাত করিল। চণ্ডে একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। বিমলার সে হাসি ভাল ঠেকিল।

বোধ হইল না ; সে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল, তিনি পিত্রালয়ে যাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে অবনীকুমারও অশ্বপৃষ্ঠে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে এক সন্দেহের উদয় হইল। অবনীকুমার ত নীহারকুমারীর সর্বনাশ করিতে যাইতেছেন না ?

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। বিমলা একবার মাত্র আহারের জন্য নীচে আসিয়াছিল।

রাত্রি হইল, তথাপি অবনীকুমার বা চণ্ড ফিরিল না। বিমলা এখনও ছাদে বসিয়া আছে ; বসিয়া বসিয়া, আপনার জীবনের ঘটনাবলী একে একে ভাবিতেছে,—বালিকা বয়সে সুখের চিত্র, কৈশরে স্বামী গৃহে বাস, যৌবনে পিতৃগৃহে বিবিধ ঘটনা—হৃদয়ের পবিত্রতা, সরলতা, তাহার অপরিমেয় আনন্দ,—একে একে সকলি তাহার হৃদয়-সরে জলবিম্বের ন্যায় ভাসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইল ; তৎপর বিক্রমপুরের যাবতীয় ঘটনার চিত্র হৃদয়ে আঁকিতে লাগিল ; অবনীকুমারের সহিত কুক্ষণে দর্শন, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য হৃদয়ের উদ্বেগ, চিত্তের শান্তির অপচয়—মহাপাপ, নরহত্যা—সকলি আঁকিল। যখন ভাবিল, এই হস্তে বিস গুলিয়া, আশ্রয়-দাতাকে দিয়াছি, তখন হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অপেক্ষাও ঘোর জ্বালা জলিয়া উঠিল। পাপিয়সী পাপভারে নিষ্পেষিত হইয়া—অনুতাপের তীব্র দংশনে ব্যাকুলা হইয়া কাঁদিল ; হৃদয় ফাটিয়া জলধারা ঝরিল। সহসা অশ্বের খুরশব্দ শুনিয়া, ছাদের আলিসার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, অবনীকুমার আসিতেছেন।

অবনীকুমার সদর দ্বার দিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহারাদির পর শয়নার্থ উদ্যানবাটীতে আসিলেন।

বিমলা রাত্রির অন্ধকারে দেখিল, কে একজন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে। চলিবার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিল, অবনীকুমার। কিন্তু এ সময়ে উদ্যানে ভ্রমণ করিবার কোন কারণ বুঝিতে পারিল না। তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া, বিমলা গোপনে থাকিয়া, তাঁহার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতে লাগিল। সে দেখিল, অবনীকুমার অস্থিরভাবে একবার নদীর তীরে যাইতেছেন, আবার উদ্যানের দ্বারে আসিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। বিমলা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিল, অবনীর কাছে আর একজন কে আসিয়া দাঁড়াইল; কি পরামর্শ করিয়া সে পুনরায় চলিয়া গেল। বিমলা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, থাকিতে থাকিতে তাহার বোধ হইতে লাগিল, আবার যেন সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিল, কিন্তু এবার আর সে শুধু আসে নাই, তাহার স্কন্ধে যেন কে রহিয়াছে, পলাইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সেই ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ধরিয়া, অতি সাবধানে এবং কষ্টে পথ চলিতেছে। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, বিমলা দেখিল, কিন্তু কাহাকে আনিল, চিনিতে পারিল না।

অবনীকুমারের একবার সন্দেহ হইয়াছিল, যেন কে ছাদে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি চলিয়া যাইলে বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিল, "যেরূপে পারি, আমাকে দেখিতে হইবে, ও কে?"

সে রাত্রিতে নীহারকুমারীর নিদ্রা আসিল না; অভাগিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত সর্ব্বরী কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে অবনীকুমার আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। নীহারকুমারী তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"ঠাকুরপো! তোমার দুটী পায়ে ধরি, আমার প্রভাতকুমারীকে আনিয়া দাও, বাছাকে কোথায় রাখিয়াছ; আমাকে না দেখিয়া হয় ত, সে এতক্ষণ মৃতপ্রায় হইয়াছে।" অবনীকুমার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"বউ! সকলি পাইবে, যদি আমার বাসনা সফল হয়। তুমি রাজি হইলেই, তোমার প্রভাতকে তোমায় আনিয়া দিব।"

নীহারকুমারী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কাতরস্বরে কহিলেন, "ছি! ঠাকুরপো! বার বার একথা বলিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না! আমাকে এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা কেন দিতেছ? তোমার পায়ে ধরি, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার প্রভাতকুমারীকে আনিয়া দাও,—প্রভাতকে না দেখিয়া, আমার হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইতেছে। সে, মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, সমস্ত রাত্রি আমাকে না দেখিতে পাইয়া, কত কাঁদিয়াছে! বল ঠাকুরপো! বল, তাহার উপর ত কোন অত্যাচার হইবে না। তাহার ত কেহ প্রাণের হানি করিবে না?"

অবনী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "যদি প্রভাতের মা, আমার উপর সদয় হয়, তাহা হইলে, তাহার উপর কোনই অত্যাচার হইবে না।"

কাঁদিয়া নীহারকুমারী কহিলেন,—"প্রভাতকে একবার

দেখিতে দাও, সমস্ত রাত্রি বাছার চাঁদ-মুখখানি দেখি নাই। তোমার পায়ে ধরি, একবার তাহাকে দেখাও।"

এই বলিয়া তিনি, অবনীকুমারের দুইটী পা জড়াইয়া ধরিলেন। তথাপি অবনীর হৃদয় গলিল না। বক্রোক্তিতে কহিলেন, "প্রভাতকে দেখিতে পাইবে, আমার প্রস্তাবে স্বীকার হইলে জীবন্ত,—নহে মৃত। তোমার সম্মুখে এখন দুইটী পথ উন্মুক্ত, কোন্ পথে যাইবে বল? আমার বাসনা সফল হইলে, সুখের আশা অনন্ত; সংসারের আবার সেই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া, সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া, ধনরত্নাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া, প্রভাতকুমারীকে লইয়া, জীবন যাপন করিতে পারিবে। আর আমার প্রস্তাবের অন্যথাচরণ করিলে, কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না, দুঃখের চিত্র কল্পনায়ও আঁকিতে পারিবে না; চিরদিন এইরূপে বন্দিনী হইয়া, নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, জন-মানবের মুখ দেখিতে পাইবে না। সপ্তদিনের মধ্যে আমি সফল-কাম না হইতে পারিলে, তোমার প্রাণের কুমারী—প্রভাতকুমারীর ছিন্নমস্তক দেখিতে পাইবে। এখন যাহা অভিরুচি করিতে পার।"

নীহারকুমারী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তেজস্বিনী চক্ষের জল মুছিয়া, উন্নতগ্রীবা বক্র করিয়া, তেজপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"নরকের কীট! রমণীর মর্য্যাদা তুই কি বুঝিবি! তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমি আমার জীবন বাঁচাইতে, বা প্রভাতকুমারীকে দেখিতে না পাইলে, সতীত্ব বিক্রয় করিব? রমণীর মর্য্যাদার নিকট, তাহার সতীত্বের নিকট,—তাহার মৃত পতির যৎ-সামান্য স্মৃতিচিহ্নের নিকট পার্থিব সুখ অতি

তুচ্ছ, অনন্ত জীবনের অনন্ত কষ্ট শ্লাঘনীয়। মাতার নিকট সন্তানের জীবন অমূল্য-রত্ন সত্য। সন্তানের জীবন বাঁচাইতে মাতা সকল স্বার্থ, সকল সুখ উৎসর্গ করিতে পারে, কিন্তু পারে না কেবল একটা জিনিষ,—তাহা এ জগতের নয়, স্বর্গেরও সুদুর্লভ—সতীত্ব। যদি ভাবিয়া থাক, প্রভাতকুমারীকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইলে, বা তাহাকে সত্য সত্যই হত্যা করিতে যাইলে, আমি মমতা হেতু সতীত্বে জলাঞ্জলি দিব, যদি ভাবিয়া থাক, আমি বাৎসল্য হেতু বা প্রাণভয়ে পাষণ্ডের হস্তে কাম ক্রীড়নক হইব, তবে সে আশা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল। অমন শত শত প্রভাতকুমারীর জীবন যদি আমার চক্ষের সম্মুখে অপহৃত হয়,—অম্লানবদনে, একবিন্দু অশ্রু না ফেলিয়া দেখিব; তথাপি সতীত্বের বিনিময়ে, কন্যার জীবনভিক্ষা লইব না।"

নীহারকুমারী নীরব হইলেন। বারিবিন্দুহীন বিশাল-নয়ন আরও যেন বিশাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চক্ষের তারা উজ্জ্বল হইল, নীরবে অবনীর মুখের পানে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অবনীকুমার হাসিয়া কহিলেন,—"বল প্রকাশ করিতে ত কেহ বারণ করিবে না।"

নীহারকুমারী ক্রোধে ললাট কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "যদি তুই আমার এ কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিস্, তাহা হইলে আমি চীৎকার করিয়া, লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিব।"

অবনী কহিলেন, "তাহা হইলে আর জীবনে বাঁচিতে হইবে না। আর এ ঘর হইতে চীৎকার করিলেও, কেহ

শুনিতে পাইবে না।" পরে আবার কহিলেন,—"আবার বলি, যদি সপ্তাহের মধ্যে সম্মত না হও, প্রভাতকুমারীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, তোমায় প্রথমতঃ ডালি দিব—তোমার সতীত্ব লোপ করিব, পরে তোমাকেও কাটিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব।"

অবনী আর কোন কথা না বলিয়াই গৃহ হইতে নির্গত হইলেন; নীহারকুমারী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবনীর ভয়প্রদর্শনগুলি সকলি শুনিলেন, শুনিয়া কেবল কাঁদিলেন। একবার মনে করিলেন এই অবসরে পলায়ন করেন। দালানের দিকের দরজা টানিয়া দেখিলেন, বাহির হইতে বন্ধ। যে দ্বারটী দিয়া অপর ঘরে যাইতে হয় এবং যেখান দিয়া অবনীকুমার আসিয়াছিলেন, সেই দ্বারটী খুলিয়া পলাইতে গেলেন। দ্বার খুলিবামাত্র দেখিলেন, চণ্ড চাঁড়াল অসি-হস্তে কৃতান্ত সহচরের ন্যায় দণ্ডায়মান। তিনি তাহাকে বিস্তর টাকার প্রলোভন দেখাইলেন, সে কিছুতেই স্বীকার হইল না। অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে, অসময়ের সহায় ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে, নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া, থালে করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ও পানীয় দিয়া গেল। বলা বাহুল্য, নীহার-কুমারী তাহার কণামাত্র স্পর্শ করিলেন না।

আবার রাত্রি আসিল; চণ্ড নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী প্রদীপ রাখিয়া প্রস্থান করিল। রজনী সমাগমে সতী নিজ সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য কাঁপিতে লাগিলেন।

এদিকে বিমলা সমস্ত দিবস গোপনে থাকিয়া উদ্যানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। সে, রাত্রিতে বাগানে আসিতে মনস্থ করিল। রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইলে, বিমলা প্রাচীরে মই লাগাইয়া প্রাচীরে উঠিল। তৎপরে মই প্রাচীরের অপর দিকে অর্থাৎ উদ্যানে নামাইয়া লাগাইল এবং চারি দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে বাগানে অবতরণ করিল; মইখানিকে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া, অবনীকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় প্রহরেকের সময় অবনীকুমার আসিয়া উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিলেন। বিমলাও তাঁহার অনুসরণ করিল। অবনী, দ্বিতলে উঠিয়া একটী দালানের মধ্য দিয়া অন্ধকারে গমন করিলেন, পরে দ্বার খুলিয়া, একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিমলা অতি সাবধানে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অবনী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, বিমলা দ্বারের নিকট অনেক ক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়াও কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। মনে করিল, বোধ হয় এই কক্ষের মধ্য দিয়া অপর গৃহে যাইবার পথ আছে, তখন অতি সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া সাহস সহকারে গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, তাহার অনুমান সত্য—অপর দিকের দ্বার খুলিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্রায়তনের দালান, তাহার পরেই কয়েকটী ঘর। সে এই সকল ঘরের মধ্যে একটীতে দ্বারের ছিদ্রপথ দিয়া আলোকের ছটা দেখিতে পাইল। বিমলা বুঝিল, অবনীকুমার এই কক্ষেই আছেন।

বিমলা দ্বারছিদ্র দিয়া গৃহে কে কে আছে দেখিতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। বোধ হইল, দুই জন অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছে। বিমলা বুঝিল, এক জন অবনীকুমার, অপর তাঁহার প্রণয়িনী।

অতি সাবধানে এদিক ওদিক করিয়া বিমলা দেখিল, দালানের অপর দিকের গবাক্ষের কিয়দংশ খোলা রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে; বিমলা অন্ধকারে থাকিয়া সেই পথে সকলি দেখিতে পাইল—একজন অবনীকুমার, অপর চণ্ডে চাঁড়াল।

সে শুনিল, অবনীকুমারকে চণ্ডে জিজ্ঞাসা করিতেছে, যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে কি হইবে।

অবনীকুমার কহিলেন,—"আমরা ত ইহার কিছুই জানি না—তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছিল, লইয়া গিয়াছে; তাহার পর পথে কি হইয়াছে কি প্রকারে বলিব। তবে যদি প্রভাত-কুমারী কোনরূপে রক্ষা পায়—তাহাতেও আমাদিগকে ধরি-বার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, সে এখনও জানে না, তাহার কাকার কত গুণ।"

প্রভুর কথা শুনিয়া ভৃত্য হাসিল। তাহারা অবশ্য অতি ধীরে কথা কহিতেছে, বিমলা যদিও সকল কথা শুনিতে পাইল না, তথাপি প্রভাতকুমারীর নাম শুনিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইল। যেন কতকটা বিষয় তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। সে ভাবিল, তাহা হইলে, কাল যাহাকে রাত্রিতে আনিতে দেখিয়াছি, সে সম্ভবতঃ প্রভাতকুমারী। তাহা হইলে নিহার-কুমারী কোথা! সে আবার শুনিল;—

চণ্ডে কহিল,—"এ যে কিছুই খাইতে চায় না, কি প্রকারে বাঁচিবে?"

অবনী কহিলেন,—"না বাঁচে, শেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিব। এত আর আমাদের নূতন নয়। দুইটী হইয়াছে, না হয় আরও দুইটী হইবে।"

চণ্ডে কহিল, "যা হউক, দুই দুইটা খুন করিলাম, কেহ একবার আমাদের সন্দেহও করিল না।"

বিমলার হৃদয়ের শোনিত শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। অবনীকুমার এবং চণ্ডে চাঁড়াল কি প্রকার ভীষণ প্রকৃতির লোক, বিমলা এখন বুঝিতে পারিল। তাহারা কহিল, তাহারা দুই জনকে খুন করিয়াছে,—একজন ত—দেওয়ানজী, অপর ব্যক্তি কে? জানিবার জন্য বিমলার কৌতূহল-প্রদীপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

অবনীকুমার হাসিয়া কহিলেন, "আমরা কি কোন কাজ অনাবধানে করি, তাই ধরা পড়িব। প্রথমবারে যখন দা—"

এই সময় বিমলার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অবনীকুমার হত ব্যক্তির নাম করিবামাত্র, বিমলা আত্মসংযমে অশক্তা হইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। অবনীকুমার ও চণ্ডে আলোক হস্তে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিমলা মূর্চ্ছিতা।

প্রভু ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"চণ্ডি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুষ্টা সকল কথা শুনিয়াছে, একে যদি জীবন লইয়া পলাইতে দি, সর্ব্বনাশ করিবে, সকল কথা প্রকাশ করিবে।"

উপযুক্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তবে একেও কি মারিতে হইবে?"

অবনীকুমার কহিলেন,—"নহিলে উপায় কৈ! এ এখন আমাদের প্রধান শত্রু—ইহাকে রাখিলে আর আমাদের রক্ষা নাই। এক কর্ম্ম কর,—রাত্রি অনেক হইয়াছে—পাপিয়সী মূর্চ্ছিতা—উহার মূর্চ্ছা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, উহাকে লইয়া, বিক্রমপুরের বাহিরে রাখিয়া আইস।" পরে তাহার দিকে ইঙ্গিত-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, কহিলেন,—"বুঝ্‌তে পেরেছ।"

চণ্ডে দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপহৃতজ্ঞানা বিমলার দেহ বাহুবদ্ধ করিয়া, তুলিয়া লইয়া চলিল। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইলে গ্রাম-রক্ষক সহ অথবা অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, এই কারণে নদীর ধার দিয়া চলিল।

নৈশ মুক্ত-বায়ু-প্রবাহ শরীরে লাগায় ধীরে ধীরে অভাগিনী বিমলার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, দৃঢ়-শরীর বলিষ্ঠ কোন ব্যক্তি তাহাকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া, বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাইতেছে, তাহা অনুমান করিতে পারিল না। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিল, অন্ধকার; একপার্শ্বে বৃক্ষাদির অস্পষ্ট আকৃতি ও অপর পার্শ্বে জলকল্লোলের কল কল রব শুনিয়া, নদী বলিয়া বোধ করিল। তখন তাহার মনে সহসা এক ভয়ের উদয় হইল—তাহাকে ত কেহ হত্যা করিতে গ্রামের বাহিরে প্রান্তরে লইয়া যাইতেছে না!

চণ্ডে এতক্ষণে প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আর অল্প পথ যাইলেই নালন্দার আম্রকানন। বিমলা সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

সে ব্যক্তি কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, বিমলা তাহার বাহু-বেষ্টন হইতে, মুক্ত হইবার জন্য সাধ্যমত বল প্রকাশ করিল কিন্তু তাহার হস্ত চুলমাত্রও সরাইতে পারিল না; তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"আমায় ছাড়িয়া দাও, নচেৎ আমি চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

এবার চণ্ড কথা কহিল, বলিল,—"আর চীৎকার করিতে হইবে না, তোমার সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।"

বিমলা আপন বিপদ বুঝিল। বুঝিল, তাহার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। বৈর-নির্য্যাতন-বৃত্তি তাহার হৃদয়ে প্রবল হইল,—ভাবিল, মরিব, কিন্তু মরিবার আগে একবার অবনী-কুমারের ভীষণ পাপের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া মরিব।"

বিমলা চীৎকার করিয়া কহিল,—"যদি কেহ নিকটে থাক, আমায় রক্ষা কর।"

চণ্ড দৃঢ়করে তাহাকে চাপিয়া কহিল,—"যম তোমায় রক্ষা করিতে আসিতেছে।" চণ্ড তাহাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, বিমলার বক্ষের অস্থি সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিমলা বিষম ব্যথা পাইয়া, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, আর একবার চীৎকার করিয়া কহিল,—"অবনীকুমার ভ্রাতৃহন্তা, সে তাহার—"আর বলিতে পারিল না। পাষণ্ড তাহাকে সেই ভীষণ কাহিনী বলিবার পূর্ব্বেই, পৃথিবীতলে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল এবং উভয় করে তাহার গলদেশ বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিল। বিমলার চক্ষের তারা কপালে উঠিল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, অভাগিনীর পাপ-জীবনের এই প্রকারে অবসান হইল।

চণ্ডে এখন মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দিবার জন্য যেমন উঠিবে, অমনি সহসা কে আসিয়া, তাহার বাম-কর দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। চণ্ডে ভয় পাইয়া, বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু দেখিল, আগন্তুক তাহার অপেক্ষা বলবান্। তখন সে কটীদেশ হইতে এক ছোরা বাহির করিয়া, তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল। অন্ধকারের মধ্যেও আগন্তুক তাহার কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, নিমেষমধ্যে অসি গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "সাবধান।"

চণ্ডে এই অবকাশে হস্ত মুক্ত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যুবকও তাহার আক্রমণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে কৌশল করিয়া, চণ্ডের দক্ষিণ হস্তে এক আঘাত করিলেন। চণ্ডে বিষম আঘাত পাইয়া, পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিল, আলোক লইয়া, আরও তিন চারিজন লোক আসিতেছে। তখন পলায়ন-চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া, সে আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অসি সঞ্চালন করিতে তাহার আর তাদৃশ শক্তি নাই; কাজেই আগন্তুক তাহাকে উপর্য্যুপরি আরও দুইটী আঘাত করিলেন। অপরাপর লোক আসিয়া, তাহাকে বেষ্টন করিল এবং কৌশলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল। চণ্ডে চাঁড়াল দেবীকুমারের নিকট বন্দী হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃহন্তা।

হাঁ, ইনি আমাদের সেই দেবীকুমারই বটেন। প্রাতঃকালে গোলাবাড়ী দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেখানে বিফল-মনোরথ হইয়া, বনগ্রামে ফিরিয়া যান। হলধর বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, একবার বিক্রমপুরে যাওয়াই স্থির করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক জন আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি তাহাদিগকে লইয়া নৌকাপথে বিক্রমপুর আসিবার জন্য অপরাহ্নে যাত্রা করেন। যখন তাঁহারা মালন্চার নীম্নস্থ নদীতে আসিয়াছিলেন, তখন বিমলার প্রথম চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। তিনি অসি হস্তে নৌকা হইতে তীরে লম্ফ প্রদান করেন, এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া আম্রকাননাভিমুখে ধাবিত হন। বিমলা আর একবার

চীৎকার করেন, দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে তিনি তাহার সকল কথা শুনিতে পান নাই। শেষ কথাটী অর্থাৎ—"ভ্রাতৃহন্তা—সে তাহার—" এই কয়েকটী কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, দুইজন লোক ঝটাপটি করিতেছে। তিনি পশ্চাতের দিক হইতে আসিয়া তাহার হস্ত চাপিয়া ধরেন; পরে যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন।

আলোক আসিলে দেবীকুমার দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। তিনি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, রমণীকে বাঁচাইবার আর কোন উপায় নাই। তখন বন্দীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার আঘাত একটী বই সাঙ্ঘাতিক নহে। প্রথম দৃষ্টিতেই দেবী-কুমার তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাহার ক্ষতস্থানাদি বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন,—"এ রমণী কে এবং কি জন্যই বা তাহাকে হত্যা করিলে?"

শোনিতক্ষয়ে চণ্ডের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, সে কহিল, "মহাশয়! আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমাকে একটু জল দিন।"

দেবীকুমারের আদেশানুযায়ী একজন জল আনিয়া দিল। চণ্ড সুস্থ হইয়া কহিল,—'আমি কোন বিষয় বলিব না, আমায় লইয়া, যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারেন। আমার বোধ হইতেছে, আমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; আমি মরিবার সময় অপরের অনিষ্ট করিব না।"

দেবীকুমার তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক আশ্বাস দিলেন, কিন্তু সে আর একটী কথাও বলিল না। তখন

তিনি তাহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলে মনে পড়ে?"

চণ্ডে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল; তাহার ভাবে দেবীকুমার বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কথায় ফল ধরিয়াছে; তিনি কহিলেন,—"তুমি এবং তোমার প্রভু জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছিলে মনে পড়ে?"

চণ্ডে দেখিল, ধরা পড়িয়াছে। নতবদনে বসিয়া রহিল। তখন দেবীকুমার কহিলেন, "এখন বল, এ রমণী কে? ইনিই কি নীহারকুমারী?"

চণ্ডে কহিল,—"না!"

দেবীকুমারের দেহে প্রাণ আসিল। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন,এই রমণীই নীহারকুমারী। তিনি আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "নীহারকুমারী কোথায়? তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছ?"

চণ্ডে কহিল,—"আমি তাহার কিছুই জানি না।" পরে কহিল, "কেন, তিনি ত কন্যার সহিত নিতাইগ্রামে গিয়াছেন।"

দেবীকুমার কহিলেন,—"তা জানি। তোমাদের সে হরের মা কে? সে এখন কোথায়?" তাহার পর তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"যদি এখনও বাঁচিতে চাহ, সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বল। বিলাসপুরের পান্থশালায় বসিয়া তুমি এবং তোমার প্রভু যে পরামর্শ করিয়াছিলে, আমি শুনিয়াছি; প্রভাতকুমারী পলাইয়া তোমাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন তোমরা নীহারকুমারীকে কোথায় রাখিয়াছ বল। যদি না বল, তাহা হইলেও তোমাদের বাঁচিবার উপায় নাই,-আমি একজন রাজকর্মচারী, তোমরা জেল ভাঙ্গিয়া

পলায়ন করিয়াছ, আমি জানি, তাহার উপর এই একজনকে হত্যা করিয়াছ। এই সকল অপরাধে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে।"

চণ্ডে নীরবে বসিয়া রহিল। দেখিল, তাহার আর বাঁচি-বার উপায় নাই; অবনীকুমারেরও আর বাঁচিবার বড় একটা পথ দেখিতে পাইল না, তবে সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বাঁচাইতে পারে, কিন্তু সেই সকল অনর্থের মূল। তাহার জন্যই আজ এই দুর্দ্দৈব। তাহার উপর, তাহার ক্রোধ হইল, একবার মনে করিল, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি, পরক্ষণেই আবার কি ভাবিয়া নিরস্ত হইল।

দেবীকুমারের মনে আর একটী সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি প্রভাতকুমারীর মুখে তাঁহার পিতার অপঘাত-মৃত্যুর কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে বিমলার মুখে "ভ্রাতৃহন্তা" এই কথা শুনিয়া, তাঁহার মনে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়াছে; ইহারই মধ্যে তিনি মনকে পাঁচবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"ভ্রাতৃহন্তা কে? অবনীকুমার ত নয়?"

এক্ষণে তিনি চণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরেন্দ্রকুমারকে কে হত্যা করিয়াছে?" চণ্ডে থর থর কাঁপিতে লাগিল। যুক্তকরে কহিল,—"যদি আমাকে রক্ষা করেন, আমি সকল কথাই বলিব।"

অবনীকুমার কহিলেন—"বাঁচাইতে চেষ্টা করিব, তবে বাঁচাইতে পারিব কি না, বলিতে পারি না; কারণ তোমার অপরাধ গুরুতর।"

চণ্ডের শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, সে দেখিল, তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা অতি কম, তাহার ম-

তাহার এই শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবারই বা তাহার প্রয়োজন কি? তখন কহিল, "আমায় আর একটু জল দিন, আমি অনেক কথা বলিব।"

দেবীকুমার তাহাকে জল পান করিতে দিলেন; সে সুস্থ হইয়া কহিল,—"আমার বর্ত্তমান প্রভুর পিতা জীবিত থাকিতেই আমি তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেছি। বাল্যকাল হইতেই তিনি নানা প্রকার কুক্রিয়াসক্ত হন, তিনি আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিতেন, কারণ আমার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার চলিবার উপায় ছিল না। কাজেই আমি তাঁহার অনেক গুপ্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার পিতা তাঁহার দুর্ব্যবহার জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই, কিছু দিন আমরা নরেন্দ্রকুমারের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। পরে আমরা বঙ্গদেশে যাই, সেখানে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কোন এক গৃহস্থের বাটীতে বাস করিবার ভাণ করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করি, কিন্তু ধৃত হইয়া, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই। তাহার পর কি প্রকারে জেলের গরাদে ভাঙ্গিয়া পলায়ন করি, আপনি জানেন। আমরা বহুকষ্টে স্বদেশে আগমন করি।

"নরেন্দ্রকুমার ভ্রাতাকে আপন আবাসে আশ্রয় দেন, তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী প্রাণপণ-যত্নে তাঁহার যত্ন ও আদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। পাপিষ্ঠ অবনীকুমার নীহারকুমারীকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মোহিত হন। তাহার পর যখন অবগত হন, তাঁহার পিতা নরেন্দ্রকুমারকে সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে আর এক ভাবের উদয় হয়।

"একদিন তিনি আমাকে তাঁহার পাপ-বাসনা বলিলেন। আমিও তাঁহাকে উৎসাহ দিই। প্রায় তিন চারি বৎসর ধরিয়া, আমরা কোন সুযোগ পাই নাই, শেষে একদিন সুবিধা ঘটিল। নরেন্দ্র দলবল লইয়া শিকারে গেলেন। আমি এবং আমার প্রভু বাড়ীতেই থাকিলাম।

"সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি এবং অবনীকুমার নালন্দার আম্রকাননে লুকাইয়া থাকি। কিছুক্ষণ থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, নরেন্দ্রকুমার অশ্বারোহণে আসিতেছেন। অবনী-কুমার একটী গাছের ডালে বসিয়াছিলেন, নরেন্দ্রকুমার যেমন সেই বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইবেন, অমনি তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। অশ্ব ভয়ে লাফাইয়া উঠিল, অবনী ও নরেন্দ্র মাটিতে পড়িলেন। জ্যোৎস্নার আলোকে নরেন্দ্র চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "একি! অবনি! এ কি করিতেছ?"

পাষণ্ড অবনী বলিল, "তোমার অকৃত্রিম স্নেহের প্রতি-শোধ দিতেছি।" ইতিমধ্যে নরেন্দ্রকুমার অবনীর বাহু বেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া পড়েন, আমি গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলি, অমনি অবনী ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দেন। তিনি চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িবামাত্র অবনীকুমার তাঁহার মুখে আরও পাঁচ সাতটী আঘাত করেন। পরে যখন দেখিলাম, তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়াছে, তখন তাঁহার আংটী প্রভৃতি লইয়া তাঁহাকে নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিই। আমাদের কাপড়ে রক্ত লাগিয়াছিল, সাবধানে সে সকল ধৌত করিয়া প্রস্থান করি। সকলে মনে করিল, তিনি দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

"ভাইকে হত্যা করিয়াও অবনীকুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তখনও দেওয়ানজি বর্ত্তমান আছেন।"

এই সময়ে দেবীকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন, "তবে কি দেওয়ানজিও তোমাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন?"

চণ্ড কহিল,—"হাঁ"; পরে বিমলার মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া কহিল, "এই পাপিয়সী দেওয়ানজির আত্মীয়, তাঁহারই বাড়ীতে থাকিত। বিমলা অবনীকুমারের প্রণয়ে আসক্ত হয়, অবনীকুমারও স্বার্থসাধনের জন্ত তাহাকে জালে জড়িত করেন। পরে তাহারই সাহায্যে দেওয়ানজীকে বিষ প্রয়োগ করা হয়।

"দেওয়ানজির মৃত্যুর পর আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হই। অবনীকুমার নীহারকুমারীর প্রণয়-লাভে অশক্ত হইয়া, কৌশলে তাঁহাকে বাড়ী হইতে লইয়া যান।"

তাহার পর যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, চণ্ড দেবীকুমারকে সকলই বলিল; এবং নীহারকুমারী এখন কোথায় আছে তাহাও বলিয়া দিল।

দেবীকুমার তখন চণ্ডকে নৌকায় উঠাইয়া বিক্রমপুরে আসিলেন; এবং অতি সাবধানে উপরে উঠিয়া গ্রাম রক্ষকের অনুসন্ধান করিলেন। সে তাঁহার পরিচয় পাইয়া কহিল, "আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?" দেবীকুমার তাহাকে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন। সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, দেবীকুমার তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "যদি সে তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহাকে দায়ী হইতে হইবে।" তখন দেবীকুমার গ্রামরক্ষক

ও কয়েকজন লোক লইয়া, চণ্ডের পরামর্শানুযায়ী উদ্যান-বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে চণ্ডের ফিরিতে বিলম্ব হওয়াতে, অবনীকুমার উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহের মধ্যে পদচালনা করিতে লাগিলেন। সহসা দালানে বহুলোকের পদশব্দ শুনিয়া, ব্যাপার জানিবার জন্ম যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি অগ্রবর্ত্তী দেবীকুমার তাঁহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"আমি তোমাকে বন্দী করিলাম।"

অবনীকুমার তখন সকল বিষয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই, কুপিত হইয়া কহিলেন,—"কে তুমি? এখনি আমার বাড়ী হইতে দূর হও, নচেৎ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব।" পরে চৌকীদারের দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তিনি কহিলেন, "ব্যাপার কি? এত লোকজন কি জন্য?"

দেবীকুমার কহিলেন, "তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য।" অবনীকুমার কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ?" দেবী-কুমার ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তোমার অপরাধ অনেক, প্রথমতঃ তুমি পলাতক-আসামী, বঙ্গেশ্বরের জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছ।" অবনীকুমার লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

আবার দেবীকুমার কহিলেন,—"দ্বিতীয়তঃ তুমি ঘোর নারকী—ভ্রাতৃহন্তা। যে নরেন্দ্রকুমার তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, যিনি তোমাকে অসময়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহার বক্ষে ছুরি বসাইয়াছ।"

নীহারকুমারী পার্শ্বের ঘরে ছিলেন। বহুলোকের পদশব্দ ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া, দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, সকল বিষয় দেখিলেন ; যখন এই ভীষণকাহিনী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। পতনশব্দে দেবীকুমার পার্শ্বের গৃহে ছুটিয়া গিয়া দেখেন, নীহারকুমারী মূর্চ্ছিতা ; তখন তিনি অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকাকে ডাকাইয়া তাঁহার শুশ্রূসায় নিযুক্ত করেন।

তৎপরে তিনি অবনীকুমারের নিকট আসিয়া কহিলেন, "তোমার তৃতীয় অপরাধ—বিষপ্রয়োগ, দেওয়ানজীর হত্যা।" অবনীকুমার থর থর কাঁপিলেন। "চতুর্থ অপরাধ—তোমার মাতৃসমা নীহারকুমারীকে ছলপূর্ব্বক গৃহত্যাগিনী করা ও তাঁহার সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প। পঞ্চম অপরাধ—প্রভাতকুমারীকে হত্যা করিবার কল্পনা। ষষ্ঠ অপরাধ—বিমলার প্রাণনাশ। ইহা অপেক্ষা মানুষের জীবনে আর কি পাপ সংঘটিত হইতে পারে? তোমার মত পাষণ্ড পাপী যদি রাজ-নিয়মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা হইলে সকলই মিথ্যা।"

অবনীকুমার অধোবদনে রহিলেন। সত্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ দৃষ্টে আর কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে কাঁদিয়া, দেবীকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহার নিজের সকল পাপ স্বীকার করিলেন। দেবীকুমার, অবনীকুমার ও চণ্ডেকে চৌকিদার হস্তে সমর্পণ করিয়া, নীহারকুমারীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

জমিদারবাটীর সকলেই জাগ্রত হইয়াছে। সরলা-সুন্দরী, চাকর, চাকরাণী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে উদ্যানবাটীতে কোলাহল শুনিয়া, কি হইয়াছে জানিবার জন্য সেই দিকে ছুটিল। প্রথমে কেহ কিছু কারণ বুঝিতে পারে নাই, শেষে একে একে সকলেই সকল তথ্য জ্ঞাত হইল।

দেবীকুমার নীহারকুমারীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইয়াছে। নীহারকুমারী বুঝিলেন, ইনিই তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা, ইঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার সতীত্ব ও জীবনরক্ষা হইয়াছে এবং পাপীরও পাপের প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি বলিয়া আর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব, ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যে আপনার মঙ্গল করুন এবং আপনাকে চিরজীবী করিয়া রাখুন।"

দেবীকুমার বিনীতবাক্যে কহিলেন,—"মা! আমি প্রশংসার কার্য্য কিছুই করি নাই; এরূপ অবস্থায় লোকের যেরূপ করা উচিত, তাহাই করিতেছি। আমি আপনাকে আর একটি শুভসংবাদ দিই, আপনার প্রভাতকুমারী নিরাপদে আছে।" এই বলিয়া, প্রভাতকুমারী ঘটিত যাবতীয় ঘটনা কহিলেন। নীহারকুমারী শুনিয়া বাষ্পাকুলিত-লোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হাতে ধরিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি আজ আমার যেরূপ উপকার করিয়াছ, তাহার প্রতিদান করা আমার সাধ্যের অতীত, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, প্রার্থনা করিব, মঙ্গলনিদান হরি যেন তোমায় কুশলে রাখেন।"

পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তিনি অবিবাহিত জানিয়া কহিলেন,—"প্রভাতকুমারী আমার অবিবাহিতা, তোমার সাহস ও সৎকার্য্যের পুরস্কার—সেই কন্যারত্ন। এখন তুমি গ্রহণ করিলে হয়।"

দেবীকুমার নম্রস্বরে কহিলেন,—"প্রভাতকুমারীর ন্যায় ললনা লাভ করিতে কাহার না বাসনা হয়?"

রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দেবীকুমার নীহার-কুমারীর নিকট বিদায় লইয়া, বিশ্রামার্থে প্রস্থান করিলেন। সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, নানা চিন্তায় সে রাত্রে নীহার-কুমারীর আর নিদ্রা আসিল না।

সরলাসুন্দরী কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়াই রাত্রির অবশিষ্টাংশ কাটাইলেন। অবনীর জীবনের দুষ্ক্রিয়াগুলি যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার প্রতি তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল!

সে রাত্রে বিক্রমপুরে আর কাহারও নিদ্রা হইল না; জাগিয়া জাগিয়াই সকলে কাটাইল। ভ্রাতৃহস্তে নরেন্দ্রকুমারের মৃত্যু—দেওয়ানজীর হত্যা—বিমলার পরিণাম,—অবনীকুমারের পৈশাচিক কাণ্ড—লোকে যতই আন্দোলন করিতে লাগিল, ততই ঘৃণা ভয় ক্রোধ প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তির উত্তেজনায় নির্নিদ্র-নয়নে শয্যায় পড়িয়া, সর্ব্বরীর শেষাংশ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

প্রভাত হইল, বালারুণের বিমল-ভাতি দিক্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অবনীকুমারের পাপ জীবনের ভীষণ-কাহিনীও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অর্থ-লালসার বশীভূত হইয়া এবং রূপ-মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া, মানব নিয়ত কত পাপ-কর্ম্মের অবতারণা করিতেছে, স্বার্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কত লোম-হর্ষণ ঘটনা সম্পাদন করিতেছে, তাহা কল্পনায় আনিতে গেলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

দেবীকুমার প্রভাতে উঠিয়াই বন্দীদ্বয়কে চৌকিদারের সমভিব্যাহারে রাজদরবারে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে নীহারকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রভাতকুমারীকে আনিবার জন্য বনগ্রামে লোক পাঠাইলেন।

যথাসময়ে প্রভাতকুমারীকে লইয়া লোক ফিরিল। নীহার-কুমারী কন্যার সন্দর্শন পাইয়া, হর্ষ-প্রফুল্ল-অন্তরে তাহার মুখ-কমলে শত শত চুম্বন দিলেন। প্রভাতকুমারী মাতার কোলে বসিয়া কেবল কাঁদিলেন। মাতা অনেক যত্নে তাহাকে নিরস্ত করিলেন।

এই সময়ে কুশী-বক্ষে নৌকার উপর আর একটী ঘটনা সংঘটিত হয়। চৌকিদার চারিজন অবনীকুমার ও চণ্ডেকে লইয়া নৌকাপথে বঙ্কেশ্বরের নিকট যাইতেছিল। অবনীকুমারের হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ, চণ্ডের হস্তপদাদিতে কোন বন্ধন ছিল না, কারণ তাহার শেষমুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চণ্ডে নৌকার উপরেই দেহ ত্যাগ করিল। রক্ষীবর্গ বড়ই বিপদে পড়িল। তাহার মৃতদেহ লইয়া কি করা কর্ত্তব্য, কেহ নির্ণয় করিতে পারিল না।

শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর এবং অবনীর প্রোরচনায় চণ্ডের মৃতদেহের সৎকার করাই স্থির হইল। নৌকা এক স্থলে লাগাইয়া, সকলে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ উপরে তুলিল। কেহ কাষ্ঠের যোগাড় দেখিতে লাগিল, কেহ অগ্নি জ্বালিবার উপায় করিতে চলিল। কেহ চিতা সাজাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সকলেই ব্যস্ত; নৌকায় যে অবনীকুমার আছেন, সেদিকে আর কাহারও বড় একটা লক্ষ্য রহিল না। আর লক্ষ্য রাখিবারও বড় একটা প্রয়োজন ছিল না, কারণ যদিও তাঁহার পদদ্বয় বদ্ধ ছিল না, তথাপি হস্তদ্বয় নৌকার সহিত উত্তমরূপে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ছিল। তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া আপন আপন কার্য্য দেখিতে লাগিল। এদিকে অবনীও অবসর পাইয়া, নিজের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। অবনী দেখিলেন, এই উপযুক্ত সময়। তিনি ভাবিলেন, অবসর পাইয়া কোন বিষয় অচেষ্টিত রাখা কর্ত্তব্য নয়, মরিতে ত হইবেই, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?

তিনি দেখিলেন, মাঝিদের একখানি বঁটি পড়িয়া রহিয়াছে। পা দিয়া আস্তে আস্তে সেইখানি সরাইয়া আনিলেন। পায়ের সাহায্যেই বঁটিখানিকে সোজা করিয়া বসাইলেন। পরে কৌশলপূর্ব্বক ধীরে ধীরে হস্তের রজ্জু কাটিতে লাগিলেন। সহজেই সফলকাম হইলেন। তিনি মুক্ত হইয়া দেখিলেন, রক্ষীবর্গ এবং মাঝিরা চিতায় চণ্ডের মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিতেছে।

নদীর তীর—বন প্রান্ত. উভয় তটেই ক্ষুদ্র বৃহৎ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিবিধ বৃক্ষ;—মাঝে মাঝে সামান্য ফাঁক। এই সকল ফাকের একটীতে চণ্ডের চিতা.—অগ্নি সহস্র-জিহ্বা বাহির করিয়া ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। পার্শ্বে দাঁড়ি মাঝি ও রক্ষীবর্গ দণ্ডায়মান। চক্ষের সম্মুখে জ্বলন্ত চিতা—শ্মশানবক্ষে শতমুখী অনল শিখার উপর মানবের যত্ন-পুষ্ট দেহ;—তাহারা দেখিতেছে—ভাবিতেছে, এই দেহের এই পরিণাম!

অবনী চিতাগ্নির উজ্জ্বলালোকে দেখিলেন, তাহারা দণ্ডায়-মান। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া, নৌকার পশ্চাৎভাগে গেলেন। অতি সাবধানে, নৌকার হাল ধরিয়া নদীবক্ষে ঝুলিয়া পড়িলেন। সাহসে ভর করিয়া অতি সন্তর্পণে সন্তরণ দ্বারা পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন।

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার; কেবল দূরে অপর তীরে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে। তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে চণ্ডের দেহ ভস্মীভূত হইয়া আসিল। তাহারা সকলে স্নান করিয়া নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ!

বন্দী কোথা ?" তখন সকলে আলোক-হস্তে নৌকার চারিধার ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোন স্থানে অবনীর সন্ধান পাইল না।

যাহাদের হস্তে বন্দীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাহারা রাজ-ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে, নদীর অপর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতটস্থ আর্দ্র-মৃত্তিকার উপর পদচিহ্ন দেখিয়া, চৌকিদারের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। তখন সকলে ভাবিল, বন্দী কোনরূপে বন্ধন মুক্ত হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়াছে এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা অস্ত্র-সাহায্যে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে বন্দীর অনুসরণ, করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনুসন্ধান করিল কিন্তু বন্দীর কোন সন্ধান পাইল না। রজনী-প্রভাতে ক্লান্ত-দেহে সকলে এক স্থলে উপবিষ্ট হইয়া, কি করা কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল ;—কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিল না।

আবার প্রভাত হইল, আবার সূর্য্য উঠিল, ডালে ডালে পাখী ডাকিল, লতায় লতায় ফুল ফুটিল, সকলি আবার পূর্ব্ব-দিনের মত হইল ;—হইল না কেবল বন্দীর গ্রেপ্তার। যাহাদের উপর বন্দীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, আতঙ্কে তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল ; বিশ্রাম করা মাথায় উঠিল, চতুর্দ্দিকে আবার বন্দীর অনুসন্ধান চলিল। নদী-পুলিনে, কাননে, নানাস্থানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু অবনীকুমারের কোন চিহ্ন পাইল না। তখন হতাশ হইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক, সে স্থলের গ্রাম-রক্ষককে সংবাদ দিল। সে গ্রামেরও

ঘরে ঘরে সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কেহ বন্দীর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তখন তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল; কোন স্থলে কোন সন্ধান পাইল না, শেষে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহারা একজন লোকের মুখে সংবাদ পাইল, এক ব্যক্তি ব্যস্তভাবে গ্রামের বাহির দিয়া যাইতেছিল; তাহার পরিধানে একখানি বই বস্ত্র নাই, কেশ রুক্ষ, দৃষ্টি—ভয় এবং সন্দেহপূর্ণ। রক্ষীগণ এই যৎসামান্য সংবাদ পাইয়া, বন্দীর অনুসরণ করিল। রাত্রি জাগরণে এবং সমস্ত দিবস পরিভ্রমণে যদিও তাহারা পরিক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি পলাতক আসামীর সন্ধান পাইয়া, তাহারা অনিদ্রা, এবং অনাহার জনিত যাবতীয় কষ্ট বিস্মৃত হইল। যেন কোন দৈববলে বলীয়ান হইয়া পুনরায় পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

এদিকে অবনীকুমার নদী পার হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করেন। নিবিড় বন, গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার পথ নাই, সুতরাং সেরূপ স্থলে পথ চলা যে, কত সুখের, তাহা অবনীকুমারই জানিলেন। কণ্টকে সর্ব্বাবয়ব ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে কোথাও আঘাত পাইয়া যন্ত্রণায় চক্ষে জল আসিতে লাগিল, কোথাও বা কণ্টকীলতায় বসনপ্রান্ত সংবদ্ধ হওয়াতে রুদ্ধগতি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; এক স্থলের বসন মোচন করিতে গিয়া দুই স্থলে আবদ্ধ হওয়াতে তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন; ভয়াকুল শ্বাপদকুল প্রাণভয়ে পলাইল; শুষ্ক বৃক্ষপত্রে তাহাদের পদশব্দ শুনিয়া অনুসরণকারী রক্ষীবর্গ ভাবিয়া, রুদ্ধ-নিশ্বাসে

দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার চলিলেন, আবার বাধা, আবার আঘাত, অবনীকুমারের চক্ষে আজ অজস্র বারি-ধারা ঝরিল। তিনি কখন কাঁদেন নাই এবং ভাবেনও নাই যে, তাঁহাকে কাঁদিতে হইবে।

মানব পাপ করিবার সময় তাহার পরিণাম চিন্তা করে না; কিন্তু যখন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়, যখন ধিকি ধিকি অনুতাপের তুষানল হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে, তখন মনে ভাবে, হায়! যদি এ কর্ম্ম না করিতাম, তাহা হইলে জীবন কত সুখের হইত।

তুচ্ছ বিষয়-লালসার বশীভূত হইয়া এবং পাপ-কলুষিত হৃদয়ে নীহারকুমারীকে বসাইয়া, অবনীকুমার ঘোর নার-কীর ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বহস্তে নিহত করিয়াছেন; বিম-লাকে ভালবাসার মোহজালে ভুলাইয়া, দেওয়ানজিকে হত্যা করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ নীহারকুমারীর সতীত্ব অপহরণ করিবার জন্য নানা কৌশল বিস্তার করিয়া, তাঁহাকে নানা লাঞ্ছনা দিয়াছেন; ভ্রাতৃকন্যা প্রভাতকুমারীকে নিধন করিতে গিয়াছিলেন এবং বিমলাকে হত্যা করিয়াছেন; আজি অবনীকুমার বিজন বিপিনে, অন্ধকারময়ী রজনীতে অনাহারে ক্লিষ্ট, প্রাণভয়ে কম্পিত হইয়া ভাবিতেছেন, "আমার দ্বারা জগতের এতগুলি অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। যদি বাল্য-কালে পিতার অবাধ্য না হইতাম, তাহা হইলে, বিষয়ের জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কখনই হত্যা করিতে হইত না। হায়, কি কুক্ষণে নীহারকুমারীকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম। যদি তাহার রূপের মোহে না মজিতাম, যদি তাহার

লাবণ্য দেখিয়া আত্মহারা না হইতাম, তাহা হইলে আজি আমাকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রুধিরাক্ত-কলেবরে এই ভীষণ বনস্থলীমাঝে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে হইত না।"

অবনী এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে, এইরূপে নয়নজল ফেলিতে ফেলিতে, প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, তখন দেখিলেন, বন-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যেমন বন হইতে বাহির হইবেন, অমনি দেখিতে পাইলেন, দূরে রক্ষীবর্গ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে। তিনি বিপরীত পথে চলিলেন। পরে বহুকষ্টে বন হইতে বহির্গত হইয়া, গ্রামের বাহিরে বাহিরে চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কি করিলে রাজনিয়মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; ক্রমাগতই চলিতে লাগিলেন।

এই দুই দিনেই তাঁহার আকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। বহু পথ চলিলেন, তত্রাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সন্ধ্যা সমাগতে আর চলিতে অসমর্থ হইয়া, এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন; বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বৃক্ষমূলেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

মানবের ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে। রক্ষীগণও তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই স্থলে আসিয়া পড়িল। তাহারা দূর হইতে রাত্রির অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিল, কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, একজন লোক শুইয়া আছে। তাহাদের মনে সন্দেহ হইল, এরূপ স্থলে আর কাহার শুইয়া থাকা সম্ভব! তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে

জাগ্রত করিয়া দেখিল, যাহার জন্য তাহাদের এত কষ্ট, এ সেই বটে। এরূপ স্থলে সচরাচর যাহা ঘটে, তাহার কোন অংশের ত্রুটী হইল না। রক্ষীদের ক্রোধের অনেকটা উপশম হইল এবং পরিশ্রমেরও যথেষ্ট লাঘব হইল। অবনীর কেবল নির্য্যাতন সার হইল।

তাহারা তাহাকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া সাবধানে রাজ-সরকারে হাজির করিল। অবনী রাজ-বিচারে পাপের উপযুক্ত ফল—নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।

হরের মা ভগ্নপদ লইয়া অনেক দিবস কষ্ট পাইয়াছিল। শেষে একদিন সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়।

আর একটী কথা বলিলেই আমাদের আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হয়। শুভদিন দেখিয়া নীহারকুমারী দেবীকুমারের হস্তে প্রভাতকুমারীকে সমর্পণ করিলেন।

দেবীকুমার বিপুল বিষয় পাইয়া, বঙ্গদেশের বসবাস ত্যাগ করিয়া, শ্বশুর বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

প্রভাতকুমারী পতির সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হইয়া, মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।